# অন্বিষ্ট

অষ্টাদশ সংকলন

শব্দ : ভাষা : ভাষ্য

মে ১৯৭৬


রবীন্দ্রনাথের একটি বর্ষার গান ॥ লীলা রায় ১

নিয়তি ও নয়ন ॥ সুকুমার ঘোষ ৮

শব্দ কোথা থেকে কেন সাহিত্যে ॥ অতীন্দ্রিয় পাঠক ৩৮

শব্দার্থের প্রকৃত রূপ ॥ পুণ্যশ্লোক রায় ৬৯

ভারতীয় সঙ্গীতে শব্দতত্ত্ব ও দর্শনচিন্তা ॥ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ৭১

বাঙলা ব্যাকরণ নিয়ে কি করা যায় ॥ প্রবাল দাশগুপ্ত ৭৬

শব্দ : ভাষা : ভাষ্য ॥ বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ৭৯


প্রচ্ছদচিত্র ॥ তপনলাল ধর


সম্পাদক

বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

সহযোগী সম্পাদক

সুধীন মিত্র ও প্রভাতকুমার দাস

কার্যালয় ৯ | ১ | ১ এ লক্ষ্মীদত্ত লেন, কলকাতা ৭০০০০৩,

ফোন নং—৫৪-২৮০৪

CENTRAL LIBRARY

অন্বিষ্টের অষ্টাদশ সংকলন 'শব্দ ঃ ভাষা ঃ ভাষ্য' সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হল। পুণ্যশ্লোক রায়ের 'শব্দার্থের প্রকৃত রূপ' প্রবন্ধটি লীলা রায় কর্তৃক অনূদিত। এ-সংখ্যা প্রকাশে নানাভাবে সাহায্য করেছেন সর্বশ্রীসুনীল ভৌমিক, শংকর ভট্টাচার্য, প্রাণরঞ্জন মাইতি, প্রদীপ মুখোপাধ্যায় ও হারাধন পাল।

পিছনের সংখ্যাগুলির মধ্যে কেবল নাট্যবিষয়ক সংখ্যা এবং প্রয়াণবিষয়ক সংখ্যার কিছু কপি আছে। যাঁদের এ-সংখ্যাগুলি প্রয়োজন তাঁরা তাড়াতাড়ি তাঁদের চাহিদা জানান।

অন্বিষ্টের আগামী সংখ্যার বিষয় ঃ বাংলার শিশু সাহিত্য।

CENTRAL LIBRARY


# প্রগতির পথ আলোকিত হোক

সুষম সার প্রয়োগে সোনা হয়ে উঠুক শস্য শ্যামলা

দি ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড

পূর্বাঞ্চল বিপণন শাখা, ৪১, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৬।

—: দেশের কল্যাণে :—

# পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা

আজই যে কোন পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা কেন্দ্রে গিয়ে
ছোট পরিবার সম্পর্কে খবর নিন।

বিজ্ঞাপন সংখ্যা ৩২৪ | ৭৫—৭৬ পশ্চিমবঙ্গ পরিবার কল্যাণ
পরিকল্পনা সংস্থা থেকে প্রচারিত।

---

বাংলা ভাষায় এত ব্যাপকভাবে লেখা বিজ্ঞান সম্মত অথচ জনপ্রিয়
বই আগে কখনো প্রকাশিত হয়নি।

## বাংলার পাখি

অজয় হোম ২০·০০

**প্রীতি প্রকাশনী**

৪১ ডাঃ ধীরেন সেন সরণী, কলকাতা-৬

---

প্রতিটি মুহূর্ত যেন নিরুদ্দেশ···।
ক্ষয়ে ক্ষয়ে বিলীয়মান জীবনের মূল্যবোধ,
তখনো কোন-কোন শব্দ এসে ধাক্কা মারে।
* প্রশান্ত রায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *

[ আসন্ন প্রকাশ ]

# আসুন বিষ্ণুপুরে
# পোড়ামাটির অপরূপ
# ভাস্কর্যের দেশে

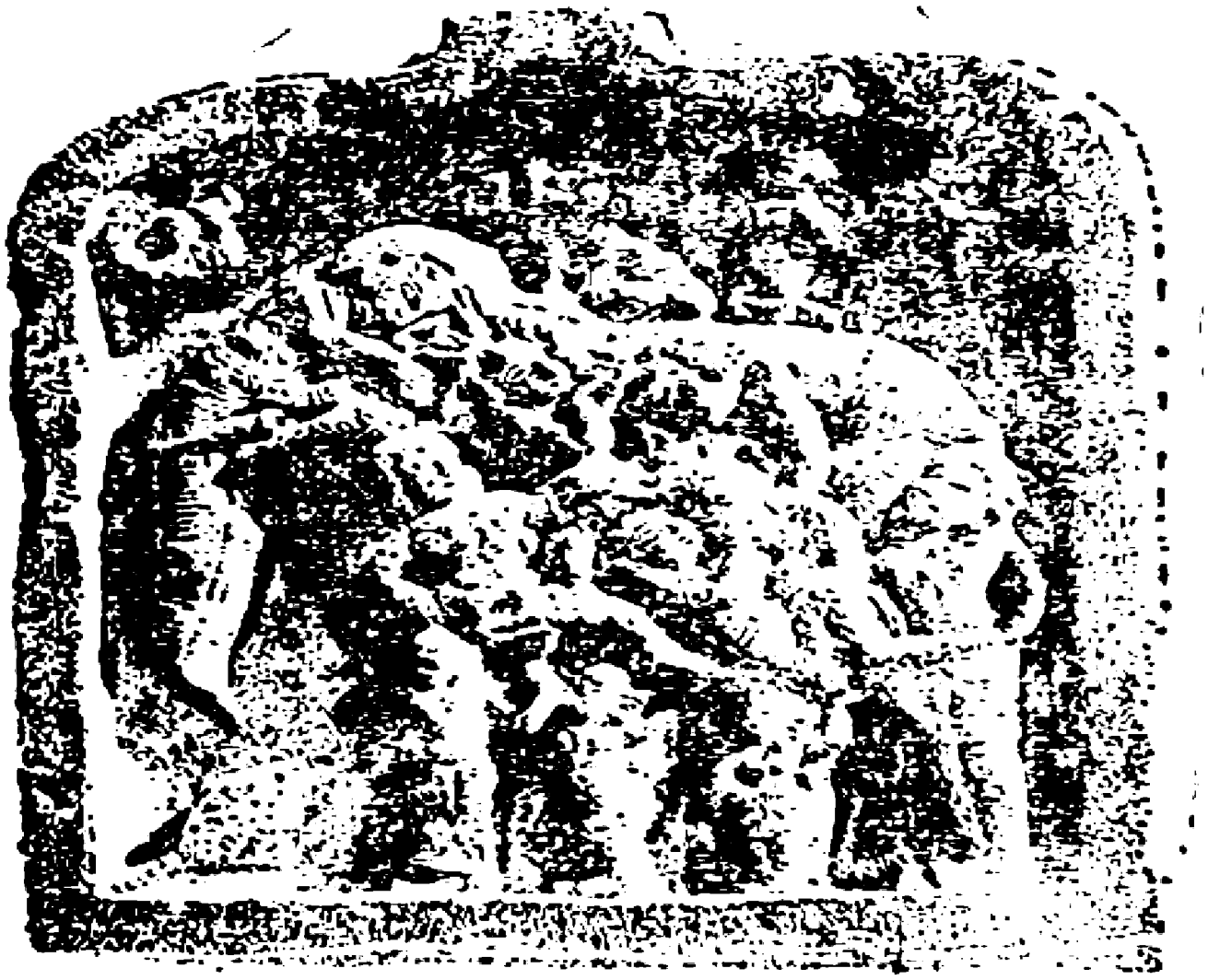

মল্লরাজা বীর হম্বীরের আমলে ও পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত মন্দির এবং তার অপরূপ পোড়ামাটির অলংকরণ বহন করছে বাংলার স্থাপত্যের সুমহান ঐতিহ্য।

রেল কিংবা সড়ক পথে বিষ্ণুপুরে যাওয়া যায়। জয়রামবাটী এবং কামারপুকুর থেকে বিষ্ণুপুরের দূরত্ব প্রায় ৪৫ কিলোমিটার।

সুনিশ্চিত স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য মনোরম বিষ্ণুপুর ট্যুরিস্ট লজে উঠুন।

বিস্তারিত জন্য খোঁজ নিন :

**ট্যুরিস্ট ব্যুরো**

৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ডালহৌসি স্কোয়ার) ঈষ্ট
কলিকাতা-১ ফোন : ২৩-৮২৭১ গ্রাম : TRAVELTIPS

স্বরাষ্ট্র (পর্যটন) বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

TCP/TB 200 A2

CENTRAL LIBRARY

## বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত

### অন্বিষ্ট/প্রয়াণবিষয়ক সংকলন ৩·০০

প্রয়াণের অর্থ প্রস্থান নয়, বরং জগৎ ও জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সংযোগে —কয়েকটি সুচিন্তিত রচনায় সেই মনোভাবই প্রকাশিত।


মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার/হিরণ্ময় চক্রবর্তী

পিতৃ পূজা/বেলা চক্রবর্তী

সমাধি কথা/ভোলানাথ ভট্টাচার্য

মৃত্যুর নিপুণ শিল্প/বীতশোক ভট্টাচার্য

ওম্মানের একাকীত্ব/অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

ফিরে আসা/দিব্যেন্দু জানা

আলোর অধিক/প্রভাতকুমার দাস

বাংলা সাহিত্য : শ্মশান-ভাবনা/বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়



পরিবেশক

বুক এ্যাণ্ড নিউজ ২১ প্রতাপ স্মৃতি কর্ণার কলকাতা-১২

অন্বিষ্ট

৯/১/১ এ লক্ষ্মীদত্ত লেন কলকাতা-৩

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্থাপি সব ঘরে ঘরে।
রাখিবে তণ্ডুল তাহে এক মুষ্টি করে॥
সঞ্চয়ের প্রথা ইহা জানিবে সকলে।
অসময়ে উপকার পাবে এর ফলে॥
॥ ব্রতকথা ॥

টাকা জমানোর পথও একটাই—একমুঠো চালের মত, নিয়মিত যত টাকা সম্ভব ইউবিআইতে রাখা। ইউবিআইতে আপনার সঞ্চয় সংসারে চিরকাল লক্ষ্মীশ্রী বজায় রাখবে। ইউবিআইতে টাকাটা নিরাপদ থাকবে, সুদে বাড়বে আর তোলাও হবে সুবিধেজনক।

ইউবিআই আপনার ওভাকাঙ্ক্ষী প্রতিবেশী।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

॥ মীরা প্রোডাক্টস্ এর একটি উৎকৃষ্ট উপাদান ॥

## চন্দনা

আজকাল প্রতিটি পরিবারের প্রত্যেকেরই এক ভীষণ সমস্যা ও ভাবন চুল ওঠা—আপনার সমস্ত ভাবনা দূর করতে পারে "চন্দনা"। অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক দ্বারা কবিরাজী মতে আবিষ্কৃত "চন্দনা তৈল" মাথার গোছা গোছা চুল ওঠা বন্ধ করে ও খুস্‌কী পরিষ্কার করে। বায়ুর দোষে মাথা গরম হইয়া যাহাদের রাত্রে ভাল ঘুম হয় না, তাহাদের নিকট অনুরোধ ১ শিশি তেল ব্যবহার করিয়া দেখুন।

একত্রে তিন শিশি ব্যবহার করিলে চুল ওঠা বন্ধ করে ও বায়ুর রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয়।

[ আপনার নিকটবর্তী স্টেশনারী দোকানে খোঁজ করুন।]

প্রোঃ—দাশগুপ্ত, পাল এণ্ড কোং
মীরা প্রোডাক্টস্।

অন্বিষ্ট পেপারব্যাক—১

বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত

# জীবনানন্দ দাশ

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার পুরোধাপুরুষ কবি জীবনানন্দের প্রতিটি কাব্য-গ্রন্থের অনুপুঙ্খ আলোচনা, কবিজীবনী এবং অদ্যাবধি কবি সম্পর্কিত যাবতীয় রচনার একটি দীর্ঘ তালিকায় সমৃদ্ধ। আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতী ও বেতার জগৎ কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত। মূল্য : ছয় টাকা মাত্র।

সূচিপত্র :


সমুদ্র সফেন (কবিজীবনী) | প্রভাতকুমার দাস
জীবনানন্দ দাশের কাব্যাদর্শ | আলোক রায়
জীবনানন্দ দাশের কৃতকর্ম ও কবিতা | সুকুমার ঘোষ
বাংলা ছন্দোমুক্তির জীবনানন্দীয় সূত্র | আবদুল মান্নার সৈয়দ
জীবনানন্দ ও পশ্চিমী কবির দল | সুধীর মিত্র
ঝরাপালক : জীবনানন্দ দাস | বীতশোক ভট্টাচার্য
সমান্তরাল পৃথিবী : ধূসর পাণ্ডুলিপি | শিবশম্ভু পাল
'বনলতা সেন' প্রসঙ্গে | অরুন ভট্টাচার্য
মহাপৃথিবীর জীবনানন্দ | মঞ্জুমিতা মিত্র
সাতটি তারার তিমিরে জীবনানন্দ | বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
রূপসী বাংলার শব্দরূপ | দীননাথ সেন
জীবনানন্দ দাশ : বেলা অবেলা কালবেলা | অমিতাভ দাশগুপ্ত
জীবনানন্দ দাশ : গল্পলেখক | বীরেন্দ্র দত্ত
জীবনানন্দ সম্পর্কিত রচনাপঞ্জী | স্বপন দাসাধিকারী


॥ সমস্ত সম্ভ্রান্ত বুকষ্টলেই পাওয়া যায় ॥


পরিবেশ : বুক এ্যাণ্ড নিউজ ২১ প্রতাপ স্মৃতি কর্ণার কলি-১২

অন্বিষ্ট

৯/১/১এ, লক্ষ্মী দত্ত লেন, কলিকাতা-৩

CENTRAL LIBRARY

লীলা রায়

# রবীন্দ্রনাথের একটি বর্ষার গান

## ধ্বনিবিশ্লেষণভিত্তিক অনুবাদ

কবিতা অনুবাদ করার সময় তার সুর নতুন ভাষায় আনার কোন চেষ্টা হয় না। এক ভাষার ধ্বনি অন্য ভাষায় আনা অসম্ভব বলে ধরে নেওয়া হয়। শব্দের অর্থ আনলেই হল। অথচ ভাব থাকে সুরে। ভাবহীন অর্থে একটা কবিতার কতটুকু থাকে? কবির অনেক কিছু হারিয়ে যায় এই ধরনের অনুবাদে।

এক ভাষার ধ্বনি অন্য ভাষায় আনা সম্ভব নয়, এটা ঠিক। তবে স্বর-বর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ একই রকম সাজানো কি যায় না? শব্দের সমতুল্য শব্দ যেমন থাকে, তেমনি ধ্বনিরও সমতুল্য ধ্বনি থাকে এবং সেই ধ্বনিগুলি যে নকশায় সাজানো হয় সেই নকশা নকল করা যায়। তবে কবিতার গঠন বিশ্লেষণ না করে এই নকশা বের করা যায় না। এখানে রবীন্দ্রনাথের একটা প্রসিদ্ধ কবিতা দেখে বুঝতে চেষ্টা করা যাবে, কতদূর তার ধ্বনি বা সুর আনা যেতে পারে বাঙলা থেকে ইংরেজীতে। আদৌ সম্ভব যদি না হয়, তাও প্রমাণিত হবে। আংশিকভাবে যদি সম্ভব হয় তাহলে কতখানি সম্ভব, এবং কি-করে সম্ভব দেখা যাবে। তবে কবি নিজে কি করে কবিতায় ভাব আনলেন তা না জানলে এর কিছুই বোঝা যাবে না।

# বর্ষার গান

লাইন

| | | |
|---|---|---|
| ১ | মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার করে আসে | অক্ষর ৩৪ |
| | ে ে অ ে ে অ ে ে আ া অ ে অ া ে | স্বরবর্ণ / ১৪ |
| | ম ঘ ব প র ম ঘ জ ম ছ ধ র ক র স | ব্যঞ্জনবর্ণ / ২০ |
| ২ | আমায় কেন বসিয়ে রাখ একা দ্বারের পাশে ॥ | অক্ষর ৩৩ |
| | আ া ে অ অ ি ে া অ এ া া ে ে া ে | স্বরবর্ণ / ১৫ |
| | ম য় ক ন ব স য় র খ ক দ্ব র র প শ | ব্যঞ্জনবর্ণ / ১৮ |
| ৩ | কাজের দিনে নানা কাজে থাকি নানা লোকের মাঝে | অক্ষর ৩৪ |
| | া ে ি ে া া ে ে া ি া া ে া ে ে া ে | স্বরবর্ণ / ১৬ |
| | ক জ ব দ ন ন ন ক জ থ ক ন ন ল ক র ম ঝ | ব্যঞ্জনবর্ণ/১৯ |
| ৪ | আজ আমি যে বসে আছি তোমারি আশ্বাসে ॥ | অক্ষর ৩৮ |
| | আ আ া ি ে ে আ া ি ে া া ি আ া ে | স্বরবর্ণ ১৪ |
| | জ ম য ব স ছ ত ম র শ্ব স | ব্যঞ্জনবর্ণ / ১৬ |
| ৫ | তুমি যদি না দেখা দাও কর আমায় হেলা | অক্ষর ৩০ |
| | ু ি া ি ে া ও অ অ আ া ে | স্বরবর্ণ / ১৫ |
| | ত ম য দ ন দ খ দ ক র ম য় হ ল | ব্যঞ্জনবর্ণ / ১৫ |
| ৬ | কেমন করে কাটে আমার এমন বাদল বেলা। | অক্ষর ৩০ |
| | ে অ অ ে া ে আ া এ অ া অ ে া | স্বরবর্ণ / ১৪ |
| | ক ম ন ক র ক ট ম র ম ন ব দ ল ব ল | ব্যঞ্জনবর্ণ / ১৬ |
| ৭ | দূরের পানে মেলে আঁখি কেবল আমি চেয়ে থাকি | অক্ষর ৩৫ |
| | ু ে া ে ে ে আ ি ে অ আ ি ে ে া ি | স্বরবর্ণ / ১৬ |
| | দ র র প ন ম ল খ ক ব ল ম চ য় থ ক | ব্যঞ্জনবর্ণ / ২৭ |
| ৮ | পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে ॥ | অক্ষর ৩৩ |
| | আ া আ া ে ে ে া ু অ অ া া ে | স্বরবর্ণ / ১৪ |
| | প র ণ ম র ক দ ব ড় য় দ র ন্ত ব ত স | ব্যঞ্জনবর্ণ / ২০ |

মোট অক্ষর ২৬৬ প্রত্যেক লাইনে অক্ষর ৩০ থেকে ৩৬

মোট স্বরবর্ণ ১১৮ প্রত্যেক লাইনে স্বরবর্ণ ১৪ থেকে ১৬

মোট ব্যঞ্জনবর্ণ ১৪৮ প্রত্যেক লাইনে ব্যঞ্জনবর্ণ ১৫ থেকে ২২

## স্বরবর্ণ

| লাইন | | |
|---|---|---|
| ১ | ২টো | এ-৮ নং<br>আ-৫ ,, |
| ২ | ৪টা | এ-৫ ,,<br>আ-৬ ,,<br>ি-১ ,,<br>অ-৩ ,, |
| ৩ | ৪টা | আ-৮ ,,<br>এ-৫ ,,<br>ি-২ ,,<br>ো-১ ,, |
| ৪ | ৪টা | আ-৬ ,,<br>এ- ৩,,<br>ি-৩ ,,<br>ো-২ ,, |
| ৫ | ৬টা | আ-৬ ,, ৃ-1 নং<br>অ-৩ ,, ো-1 নং<br>এ-২ ,,<br>ি-২ ,, |
| ৬ | ৩টা | আ-৫ ,,<br>এ-১ ,,<br>অ-৪ ,, |
| ৭ | ৫টা | এ-৭ ,,<br>আ-৪ ,,<br>ি-৩ ,,<br>অ-১ ,,<br>ৃ-১ ,, |

| | | |
|---|---|---|
| ৮ | ৪টা | আ-৬ নং |
| | | এ-৪ ,, |
| | | অ-৩ ,, |
| | | ঁ-১ ,, |

একটি লাইনে ৬টি স্বরবর্ণ দেখা যায়—৫নং লাইন

৪টি লাইনে ৪টা স্বরবর্ণ দেখা যায়—২-৩-৪ এবং ৮নং

১টা লাইনে ২টি স্বরবর্ণ দেখা যায়—১নং

২টি লাইনে ৩টি স্বরবর্ণ দেখা যায়—৬ এবং ৭নং

স্বরবর্ণের নকশা

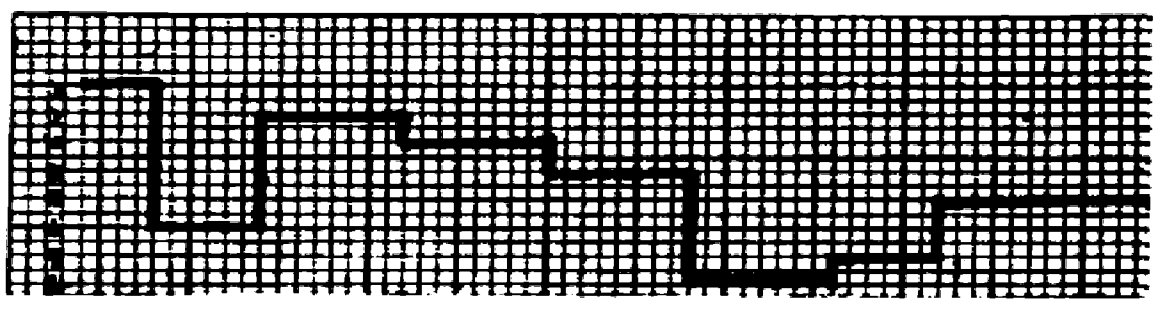

এক একটা স্বরবর্ণ সংখ্যা আ-৪৬ এ-৩৯ ে-৪

আ-১৪ ি-১২ ু-২

'আ' এবং 'অ' এক সঙ্গে নিলে হয়—৬০ কাজেই 'আ' এবং 'অ' স্বরবর্ণের মধ্যে প্রধান। প্রত্যেকটা লাইনেই আছে।

নকশা এই রকম ঃ

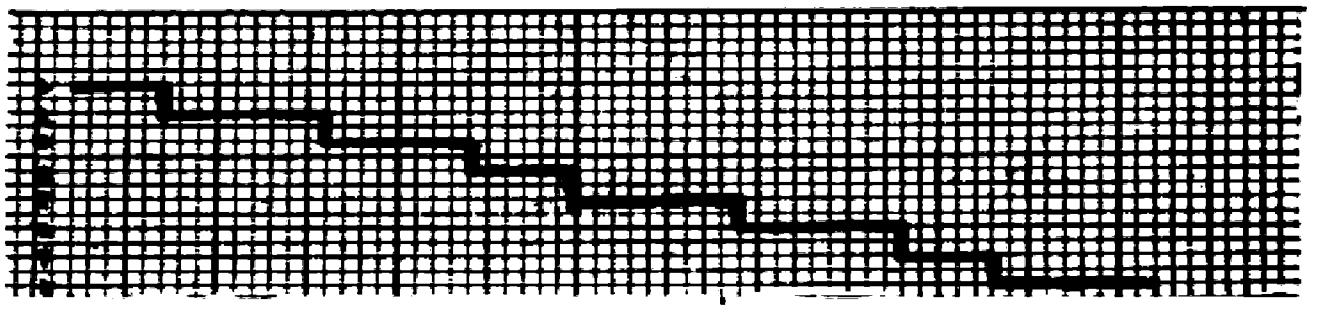

'এ' ৩৯ বার দেখা দেয়। তার নকশা এই রকম ঃ

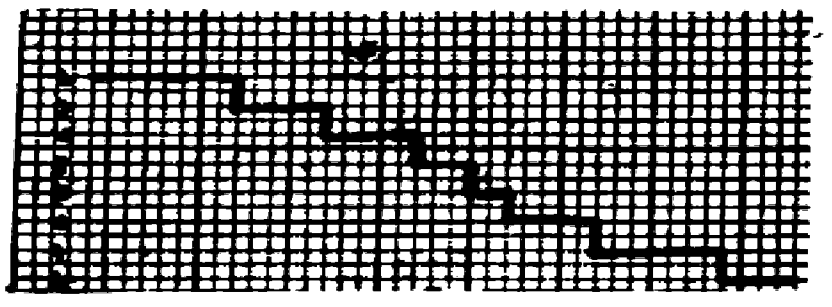

দুটি মাত্র স্বরবর্ণ সব লাইনে আছে 'এ' এবং 'আ'

সব স্বরবর্ণ মাত্র দুটি লাইনে আছে লাইন নং ৫ এবং ৭
৪টি স্বরবর্ণ ৪টি লাইনে আছে।

৩টি স্বরবর্ণ ১টা লাইনে আছে।

২টি স্বরবর্ণ ১টা লাইনে আছে।

উচ্চারণে 'ে' এবং 'অ' কাছাকাছি হয়।

"ে।" দেখা দেয় তিনটি লাইনে ৩-৪-৫

"ৃ" দেখা দেয় তিনটি লাইনে ৫-৭-৮

"ি" দেখা দেয় পাঁচটা লাইনে ২-৩-৪-৫-৭

সব স্বরবর্ণের নকশা দেখানোর দরকার নেই।

বিশেষ নকশা দুটি পাওয়া যায়

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১ | এ এ আ | তিন বার দেখা দেয় লাইন | ১ |
| | | দু ,, ,, ,, ,, | ৭ |
| | | এক ,, ,, ,, ,, | ৪ |
| ২ | আ আ এ | দু ,, ,, ,, ,, | ১ |
| | আ এ | চার ,, ,, ,, ,, | ২ |
| | | ,, ,, ,, ,, ,, | ৩ |
| | | ,, ,, ,, ,, ,, | ৪ |
| | | তিন ,, ,, ,, ,, | ৫ |
| | | চার ,, ,, ,, ,, | ৬ |
| | | চার ,, ,, ,, ,, | ৭ |
| | | দু ,, ,, ,, ,, | ৮ |

এই দুটি নকশার মধ্যে মিল আছে। একটা উল্টিয়ে দিলে অপরটি হয়। অন্য কোনো বিশেষ নকশা চোখে পড়ে না।

স্বরবর্ণে বৈলক্ষণ্য নেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। 'আ-া-া। দীর্ঘ নিশ্বাসের মত। ভাবের পরিবর্তন নেই। তবে 'এ' চঞ্চল ভাবে 'আ' এর আশেপাশে ঘুরতে থাকে।

## ব্যঞ্জনবর্ণ

'এ' এর চঞ্চলতা ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যেও দেখা যায়। সংখ্যা অনেক কিন্তু শৃঙ্খলা নেই।

| লাইন | সংখ্যা | নং | নং |
|---|---|---|---|
| ১ | ১১ | হ-৫ | ক-১ |
| | | ম-৩ | প-১ |
| | | র-৩ | ষ-১ |
| | | গ-২ | খ-১ |
| | | ণ-১ | জ-১ |
| | | | চ-১ |
| ২ | ১৮ | ক-৩ | ম-১ |
| | | ন-১ | ব-১ |
| | | হ-৩ | প-১ |
| | | য়-২ | স-২ |
| | | দ-১ | (দ্)-১ |
| | | ণ-৩ | |
| ৩ | ১৯ | ন-৫ | ল ১ |
| | | ক-৪ | ম-১ |
| | | জ-৩ | দ-১ |
| | | র-২ | ফ-১ |
| | | হ-২ | |
| ৪ | ১৬ | হ-৪ | ছ-১ |
| | | ম-২ | র-১ |
| | | জ-২ | ব-১ |
| | | স-৩ | ত-১ |
| ৫ | ১৫ | ম-২ | ক-২ |
| | | হ-২ | ল-১ |
| | | খ-১ | ত-১ |
| | | র-১ | দ-৩ |
| | | ন-১ | র-১ |
| ৬ | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৬ | ১৬ | ক-৩ | ব-২ |
| | | ম-৩ | ট-২ |
| | | ন-২ | দ-১ |
| | | র-২ | ল-২ |
| ৭ | ১৯ | ক-৩ | র-২ |
| | | হ-৩ | প-১ |
| | | ল-২ | ন-১ |
| | | ম-২ | দ-১ |
| | | ব-১ | চ-১ |
| | | য়-১ | থ-১ |
| ৮ | ১৯ | র-৪ | ম-১ |
| | | ন-৩ | প-১ |
| | | ব-২ | দ-২ |
| | | হ-১ | য়-১ |
| | | ক-১ | স-১ |
| | | ত-২ | |

লাইনে ২টো থেকে ৬টা স্বরবর্ণ আছে

,, ১১টা ,, ১৯টা ব্যঞ্জনবর্ণ আছে

| | | | | নং |
|---|---|---|---|---|
| ১৯ | ব্যঞ্জনবর্ণ | তিন | লাইনে | = ৩, ৭ এবং ৮ |
| ১৮ | ,, | এক | ,, | = ২ |
| ১৬ | ,, | দুই | ,, | = ৪ এবং ৬ |
| ১৫ | ,, | এক | ,, | = ৫ |
| ১১ | ,, | এক | ,, | = ১ |

আলাদা করে ব্যঞ্জনবর্ণ আছে :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| হ-২০ | ম-১৫ | র-১৫ | গ-২ | ন-৫ | ক-১৭ |
| প-৪ | স-৭ | দ-৯ | জ-৬ | চ-৩ | য়-৫ |
| | ব-৭ | ত-৭ | ল-৪ | | ঙ্ক-১ |

(ট)

মোট ১৭টি ব্যঞ্জনবর্ণ 'দ' ও 'ধ'—'ত' ও 'ট' এক সঙ্গে

'ত' ও 'থ' দেওয়া আছে

২টি ব্যঞ্জনবর্ণ আসে ১৫ বার | প্রধান ব্যঞ্জনবর্ণ

২টা ,, ,, ১৬ ,, | ক, ন, ম, র ও হ

১টা ,, ,, ১৭ ,, |

১টা ,, ,, ২০ ,, | বিস্তার : ১ থেকে ২০ পর্যন্ত

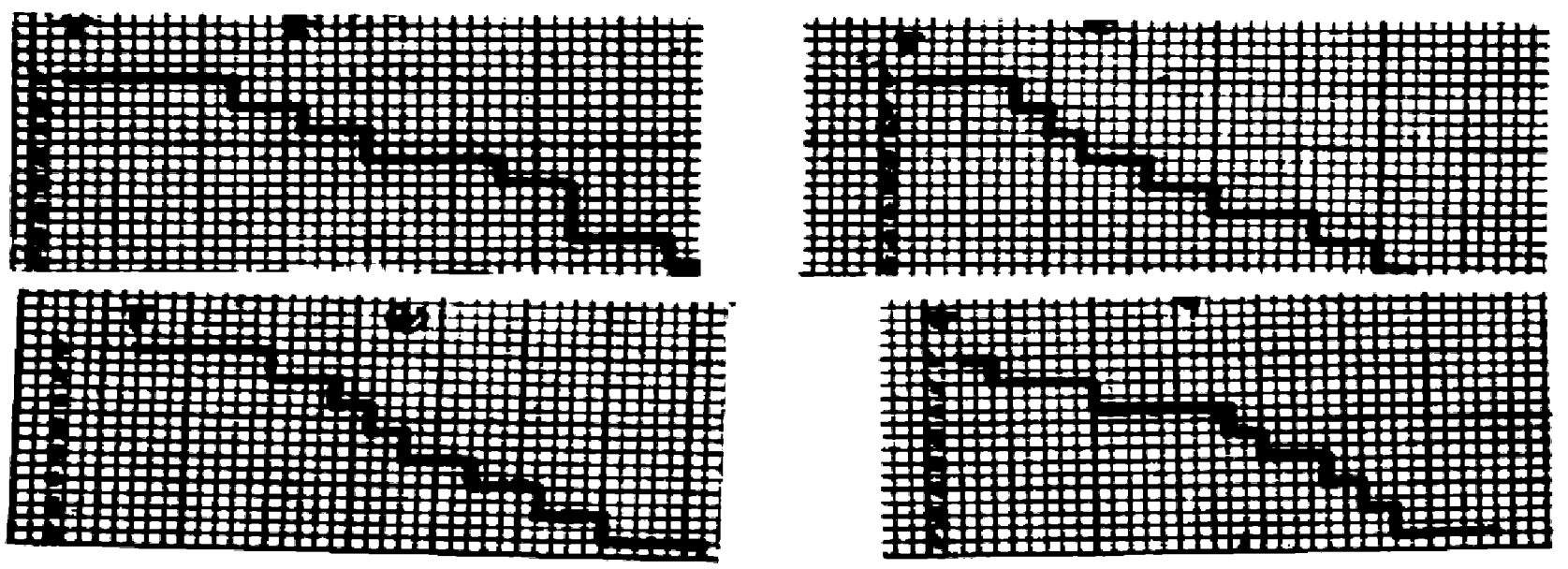

দেখা যাচ্ছে ব্যঞ্জনবর্ণের কোনো নকশা নেই ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করা হয়েছে। নকশা হয় না দুটি অক্ষর দিয়ে অথচ ক এবং র ছাড়া কোনো ব্যঞ্জনবর্ণ বার বার একসঙ্গে আসে নি।

"হ" ও "ক" চঞ্চল ও অল্প একটা বিরক্ত ভাব প্রকাশ করে।

"স" ও "ন" সাবধান ও সহিষ্ণু। "র" দৃঢ়তা প্রকাশ করে।

এই ব্যঞ্জনবর্ণ ছিটানো ছড়ানো কবিতার মধ্যে।

কবি কিভাবে এই কবিতায় মিল এবং ছন্দ দিয়ে শুধু নয়, স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়েও তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেছেন দেখা যাচ্ছে। কত দূর ইংরেজী ভাষার মধ্যে তাঁর স্বর-ভাব বা ধ্বনি-ভাব আনা যায় পাঠক বিচার করবেন। যতটা পেরেছি আমি করেছি। অন্য কেউ হয়ত আরো ভালো ভাবে করবেন এক দিন।

## SONG OF THE RAINS

**Rabindranath Tagore**

Clouds upon clouds are mounting. Dark it grows.
Why am I kept sitting here, alone beside the door ?
On other days there's work to do in other's company.
But today I wait for your coming expectantly. If
neglectfully, you come to see me not, with what
am I to pass this rainy hour ? There's nothing
to do but stare open-eyed into the faraway
While my heart wails upon the wild wandering wind,

CENTRAL LIBRARY

সুকুমার বোষ

# নিয়তি ও নয়ন

বাক্‌ন্যায়দর্শন সূত্রের খসড়া

১ নয়ন ততোদূরই যায়, যে-অবধি না নিয়তি তার হঠকারকে নিবৃত্ত করে।

১১০১ আবার নিয়তির গোলোক ধাঁধায় নয়নের পথসন্ধানই দর্শন।

১০১ দর্শনের স্থান প্রকৃতিবিজ্ঞানের উপরে পাশে বা তলায় বিচ্ছিন্নভাবে কোথাও নয় ; বরং, দর্শন বিজ্ঞানের চর্ম।

১০১২ দর্শনের আদিলোচন—এক অর্থে দৃষ্টি, অন্য অর্থে আলো। দুটোর যৌথকর্মসূচী পালন করে চোখ।

( অন্ধের দৃষ্টি অভ্যন্তরে। নীতিবাচন চিন্তাকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে আনার ফলশ্রুতি। তাই কি জন্মান্ধরা হয় টাইরেসিয়স নতুবা ধৃতরাষ্ট্র ? )

১০২ বস্তুবিশ্বের বিকারে কালের আয়তন ও চলত্ব বোঝা যায়। এখানে স্থান ও কাল একাকার।

( যাযাবর মানবগোষ্ঠীই এটা আগে ধরতে পেরেছে। )

১০২১ কালস্রোতে প্রপাত ঘূর্ণী দহ ইত্যাদি আছে। স্রোতে ভেসে গেলে নিয়তিকে মানি, কিন্তু যখন সাঁতরে পেরোতে যাই, তখন নয়নই আমার নেতা।

১০২২ ঘটনার ধারাবাহিকতায় যেই ছেদ পড়ে, দেখতে পাই নিয়তিকে—নয়ন যতোই তীক্ষ্ণ হোক। অবশ্য পাঁচজনে এর পাঁচরকম ব্যাখ্যা করতে পারে। একে ভ্রম বলবো না, ভ্রম নয়নেরই অবসাদ।

১০৩ যাবতীয় ধারণায় আমরা দুটো মেরু খুঁজি—সেই দুই প্রান্ত : আদি ও অন্ত। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে এই মেরু দুটি জ্ঞানেরও পর্যাপ্তবোধক—যেমন ধনী-গরীব, ভালো-মন্দ ইত্যাদি। অসীম ধনী বা অসীম মন্দের কোনো তাৎপর্য সান্ত মনুষ্যজীবনে নেই।

১০৩১ অতএব, আদি অন্তই জাগতিক হেতু। এই ন্যায়ে বর্তমান চলেও চলছে না। চরম বৃহৎ একজায়গায় গিয়ে সান্ত ব্রহ্ম—যখনই বিষয়টি ধারণার আখ্যা দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি।

১০৪ অনাদি ও অনন্ত শব্দদুটি নিরাশ্রয়। এই সব ধারণার ব্যাপারে, স্বভাবতই, আমরা স্বতোবিরোধের পাল্লায় পড়ি।

১০৪১ যখন বলা হয় : পূর্ণ থেকে পূর্ণ বাদ দিলে পূর্ণই থাকে, আবার, পূর্ণের সঙ্গে পূর্ণ যোগ করলেও পূর্ণ থাকে, ( লৌকিক সংস্কারে বা ) কাণ্ড জ্ঞানে বক্তব্যটিকে হয় হেঁয়ালি বলবো, নতুবা নির্বোধক।

কিন্তু যদি বলা হয় :

'সব' থেকে 'সব' বাদ দাও ··· ··· ··· ( ক )

'অনেক' থেকে 'অনেক' বাদ দাও ··· ··· ··· ( খ )

'কিছু' থেকে 'কিছু' বাদ দাও ··· ··· ···( গ )

উপরের কাণ্ডজ্ঞান প্রয়োগ করেই ( খ ) ও ( গ )-এর বেলায় জবাব দেবো 'অন্তত একটা' থাকতে পারে, আর, ( ক )-এর বেলায় বলবো-কিছুই থাকবে না। এখানে কাণ্ডজ্ঞান খাটলো কি করো ? পরিমাণ-গুলি নির্বিশেষ হলেও খিল।

১০৫ সংস্কারবশতই ভাবি—আদি আছে অন্ত আছে অথচ অনাদি নেই অনন্ত নেই—তা কখনো হতে পারে ?

১০৫১ স্বর্গ নরক এবং উপরে বর্ণিত অনাদি অনন্ত—এগুলো ইতি-র নেতি-প্রতীক ( অর্থাৎ ইতির দুই পাশে দুই নেতি মেরু )।

| নেতি | ইতি | নেতি |
|---|---|---|
| স্বর্গ, আকাশ | মর্ত্য | নরক, পাতাল |
| | খিল সংখ্যা | |
| O, $1-1$ | (1, 2, 3,...12) | L, $-\frac{1}{1-1}$ |
| একটা-না-একটা কিছু, | সব, সমগ্র, একটা | অনেক, অসংখ্য |
| অনাদি | আদি অন্ত | অনন্ত |

১০৬ মানুষের ব্যবহার্য কাল বা ল-কারের ধারণাও সসীম। অতীত—স্মৃতিচিহ্নিত শেষ তাৎক্ষণিক বিন্দু। প্রতিমুহূর্তেই ভবিষ্যৎ থেকে পৃথক করছি বিন্দুকাল। ঠেলে দিচ্ছি বাঁদিকে—আমার পিছনে। ভূত-ভবিষ্যৎ সচল ভৌম অক্ষ, বর্তমান স্থিরকল্প লম্ব অক্ষ। ব্যবহারিক বর্তমান সেই ভবকাল—স্থির অল্পব্যাসযুক্ত বর্তুল তার আওতা।

এই রকম সায়তন ভবকালে কেউ ডাকলে সাড়া দিই—'যাই' বা 'যাচ্ছি', যদিও ওঠবার লক্ষণ নেই আমারা চলমান পাটাতনের উপর স্থির থাকার চেষ্টায় বর্তমান ক্রমাগত পা পাল্টাচ্ছে।

১০৭ পাথর, মরা গাছের গুঁড়ি বা এতৎসদৃশ মসৃণ জায়গায় বিশ্রামের জন্যে বসা যায়। নৈসর্গিক আসনের তুল্য কেউ একটা বসবার আসন—ধরা যাক চেয়ার—তৈরি করলো। প্রথম অহঙ্কারের মনোবৃত্তি তার মধ্যে দেখা গেলো। মনোবৃত্তি ছাড়া নিদর্শ ও সম্ভাব্যে অভেদ-সামান্য আরোপ করতে পারে না কেউ।

১০৭১ দেখাদেখি অনেকেই এই রকম চেয়ার বানালো। কেউ কেউ সেই রূপে একটু হেরফের ঘটালো, প্রাতিস্বিক অহঙ্কারবশত। সামান্যত, প্রতিটি বসার আসনই হলো চেয়ার, কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে—কোনটা গোল চেয়ার, কোনটা হাতল-অলা, কোনটা কাঠের আর কোনোটা

বা বেতের চেয়ার। প্রত্যেক কারিগরের ধারণায় আছে চেয়ারের আদল।

১০৮ মানুষের ব্যবহারিক জীবনে দুটি বিপরীত ক্রিয়া : অনুকরণ আর অহঙ্কার।

১০৮১ মানুষের প্রবৃত্তি—অনুকরণ, মহাজনকে অনুসরণ করা (পথ সম্পর্কে যুধিষ্ঠিরের আপ্তবাক্যটি স্মরণ করুন)।

১০৮১১ অহঙ্কার তাকে রূপভেদে তাড়িত করে। এই অহঙ্কারের কারককে মনোবৃত্তি বলা যেতে পারে।

১০৮২ প্রবৃত্তি যেহেতু যৌথজীবনের মূল, সমাজবদ্ধ মানুষের অহঙ্কারে প্রবৃত্তির চিহ্ন তাই সুপ্ত থাকে।

১০৮২১ সমষ্টিবুদ্ধির সামান্য-অভেদ প্রবৃত্তি। নিদর্শের পথ থেকে সরে গিয়ে সম্ভাব্যের দিকে ধাবিত হওয়ার প্রত্যেক বুদ্ধিই অহঙ্কার।

১০৮৩ নিয়তি-নির্দিষ্ট আওতার মধ্যেই আমরা আমাদের দেশ ভাষা জাতি গোষ্ঠী বিজ্ঞান ইতিহাস পুরাতত্ত্ব—সব কিছুরই সীমা নির্দেশ করি। সব কিছুর বিবর্তনে প্রবৃত্তি মনোবৃত্তির টানাপোড়েনই একমাত্র লক্ষণীয়।

১০৮৩১ আমরা যা-ই বলি না কেন, সমষ্টিসিদ্ধিকে অতিক্রম করার ক্ষমতা আমাদের কারো নেই। না হলে, একজন আরেকজনকে বুঝতে পারতাম না, বোঝাতেও পারতাম না।

১০৮২২ স্বভাষী একজন বিদগ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে আমার জ্ঞানের তফাৎ কি? তিনি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ব্যপদেশের আখ্যা জানেন। আখ্যাগুলি ব্যাখ্যা করুন, আমি অবশ্যই বুঝবো, কারণ উপাদানগুলি ও তার সাজানো আমারও বাক্‌ন্যায়সিদ্ধ।

২০০১ Unicorn বা কবন্ধ আছে কি নেই এটা দর্শনের জিজ্ঞাস্য নয়। বরং বিচার্য, এরা কি আমার ধারণার বাইরে? তা নয়; অন্তত ওই শব্দ দুটির গোষ্ঠীসিদ্ধি আছে আর ওই সিদ্ধি দাঁড়িয়ে আছে সিদ্ধ-রূপের সমবায়ের উপর।

কবন্ধ উপাখ্যানে আরো চিত্তাকর্ষক ব্যাপার—'তারা খায় কি করে' এ-প্রশ্নের উত্তর কবন্ধস্রষ্টারা দিয়ে রেখেছেন 'পেটের মধ্যে মুণ্ড আছে'। মুণ্ড ছাড়া খাওয়া যায় না—এটাই অভিজ্ঞতা এবং কাল্পনিক জীবের ক্ষেত্রেও তা মান্য।

২০০১১ কোন পশুর দাঁত আছে কিনা দেখতে তাকে হা করাবো। দাঁতের মতো একসারি পদার্থ যদি অন্যত্র অন্য ব্যবহারের জন্যে থাকে, তবে তাকে দাঁত বলবো না। দাঁত এই নামের সঙ্গে তার উদ্দেশ্য ও সিদ্ধরূপ জড়িয়ে আছে না কি ?

২০০১২ ছোটবেলায় ঠাকুমা যখনই ভগবানের কথা পাড়তেন আমার মনে ভেসে উঠতো গ্রামের ভগবান মণ্ডলের মুখ—পুরোনো টাকায় পঞ্চম জর্জের গালে দাড়ি থাকলে যেমন দেখাতো সেইরকম। কালবৃদ্ধ ভগবানের সঙ্গে মিলে যেতো আমার মনের আদর্শ পট।

ঠাকুমার মনেও কি কোনো ছবি ভাসতো ? দুহাত বা চার হাতঅলা মানুষের ছবি ?

উপনিষদে আছে, পিণ্ড থেকে সৃষ্ট মানুষের রূপ পুরুষ। শব্দটির লক্ষ্য পুরুষ বিধাতা।

প্রতিমাবিরূপ ধর্মবিশ্বাসীরা যখন বলে তাদের ধর্মগ্রন্থ ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত, তখন কি সঙ্গে সঙ্গে একটি উচ্চারণকারী মুখও কল্পনা করে না ? আবার, অন্যভাবে বাণী উচ্চারণ করার ব্যাপদেশ কি আমরা কেউ কাউকে বোঝাতে পারবো ?

২০০২ আমরা অনেক সময় মন থেকে গরুর ছবি আঁকি। কথোপকথনেও আমরা অবর্তমান গরুর প্রসঙ্গ তুলতে পারি, এবং গরু শব্দটি ধারণা করতে পারি। সাক্ষাৎ গরুতে আছে নিদর্শ আর আমার মনে আছে আদর্শ—আর সেই আদর্শে আছে আমারই আরোপ করা পরিসীমা। এই পরিসীমাই আমি ছবিতে আঁকবো।

২০০৩ কাউকে বললাম 'অমুক মেয়েটা সুন্দরী' কি 'অমুক ছবিটা সুন্দর'। সুন্দরে এক সামান্যমণ্ডলকে খাড়া রেখে আমি বলছি আর কেউ শুনছে।

বিশেষ মেয়েটি বা ছবিটি সম্পর্কে মতদ্বৈধ আছে হয়তো, তবে সে-দ্বিধা 'সৌন্দর্য' বিষয়ে নয়, 'সৌন্দর্যের' আদর্শের তারতম্যে। অসাক্ষাৎ নারীর সৌন্দর্যের কথা আমার মুখে শুনে শ্রোতা যে আদর্শ মুখটি কল্পনা করেছে, সাক্ষাতে তার সঙ্গে মিল না হওয়ায় সে নিরাসক্ত হতে পারে।

কিন্তু সামান্যমণ্ডল সম্ভব না হলে 'সুন্দর' কথাটাই ভাষায় আসতো না।

২০০৪১ আর, মনোবৃত্তি বিশেষ থেকে বিশেষান্তরকে পৃথকভাবে জানতে চায় বলেই সুন্দর, অসুন্দর, ক খ-এর চেয়ে সুন্দর, ক সবচেয়ে সুন্দর ইত্যাদি ব্যপদেশ ও তার বাক্‌সঙ্কেত।

২০০৪২ আহ্লাদ যন্ত্রণা এবং স্বাদ গন্ধের 'সু' ও 'দুঃ'-এর অস্তিত্বও, এই রকম, সামান্যসিদ্ধির ভাষার তালিকায়।

ক যখন বলে 'পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে' (আমার যদি কদাপি শরীরের ওই অংশে যন্ত্রণা নাও হয়ে থাকে) আমি ওকে একটি আদর্শ যন্ত্রণার প্রেক্ষিতে বসিয়ে ওর অবস্থা উপলব্ধি করবো।

'যন্ত্রণা' শব্দটির স্থিতিই ওই সামান্যসিদ্ধির আদর্শ ধারণায়। এর তারতম্যও আমরা বের করি বিশেষণ লাগিয়ে—কম যন্ত্রণা কি বেশি যন্ত্রণা, অথবা বাহ্যলক্ষণকে ভাষায় ব্যাখ্যা করে—যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, যন্ত্রণায় ছটফট করছে, হু-হা করছে, চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে, হাত পা বেঁকে যাচ্ছে ইত্যাদি।

ব্যপদেশ নেই তবু বাহ্যলক্ষণ ফোটানো হচ্ছে—অভিনয় এটা, কিম্বা ভান।

২০০৪৩ গন্ধের 'সু' কিম্বা 'দুঃ' আমরা বুঝি কি করে? এই ভেদজ্ঞানের মূলে অভ্যাস না সহজাত প্রবৃত্তি?

কিছু প্রাণী পচা ও টাটকা মাংসে ভেদ করে না। যারা শুঁটকি মাছ খায়, শুঁটকি গন্ধ তাদের কাছে বিরক্তিকর নয়। এটা কি

প্রবৃত্তি-বিরুদ্ধ মনোবৃত্তির ব্যাপার ? অন্য পচা দুর্গন্ধেও তো তাদের বিরক্তিকর প্রতিক্রিয়া হয় ।

আবার, কেউ যখন 'ইলিশ মাছের গন্ধে আমার বমি আসে' বলে—আমরা হা হা করে উঠি ( তবে 'গন্ধ'কে এখানে সে দুর্গন্ধ-অর্থে ব্যবহার করে না ) ।

২০০৪৫ চলতি কথায় শোনা যায়—লোকটার 'ঘেন্নাপিত্তি' নেই । কথাটা ঘৃণা প্রবৃত্তি । ঘৃণা ও ভালোবাসা বর্তমানে মানুষের প্রবৃত্তির বিষয় । সভ্যতার একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠায় আমরা এরকম ভাবছি ।

২০০৪৬ হায়েনার হাসি ব্যাপারটা কী ? নীরব হাসিকে হাসি বলে শনাক্ত করি কি করে ? মুখের পেশীকুঞ্চনের একটি আদর্শ রূপরেখাকে হাসি আখ্যা দিয়েছি । 'কি হে, হাসি-হাসি মুখ যে', কাউকে হয়তো বলি এবং ক্বচিৎ ভুল বলি । আবার এ-ও বলি 'মুখ হাঁড়ি ( বা কালো ) করে আছো যে ?' হাসিটা কি দৈহিক স্নায়ুতাড়না ? অসম্ভব নয়, দুধের শিশুও হাসে । হায়েনাও শিকারের সাক্ষাৎ পেলে লুব্ধ হয়, আর সে-লোভের প্রকাশ ঘটে মুখপেশীর বিশেষ প্রসারণে । সেটা আমাদের আদর্শের রূপরেখার সঙ্গে মিলে যায় বলে আমরা হায়েনার হাসি দেখি ( রবতো বাড়তি উপসর্গ ) ।

২০০৫ চিরমিথ্যুকও কেউ নেই, আছে আদর্শ মিথ্যুক—শতকরা হিসাবের ভিত্তিতে কম বা বেশী । সুতরাং, অনেক কথা বলার পরে মিথ্যুক তো বলতেই পারে 'এতোক্ষণ যা বললাম সবই মিথ্যে' । সে-ও বাবা-মাকে বাবা-মা বলে, ভাত চেয়ে ভাতই আশা করে, যন্ত্রণায় কাতরায় ইত্যাদি ।

গোষ্ঠীসিদ্ধ ভাষার জগতে চিরমিথ্যুকের বাঁচার সুযোগ নেই । ( পালে-বাঘ-পড়া রাখাল বালকেব শেষ স্বাহিবার্তা অবশ্যই সত্য ) ।

২০০৬ পুরোনো বন্ধুরা একজায়গায় হলেই স্মৃতিরোমন্থন করে, এবং আনন্দ পায় এতে । কেন ? এটা কি মাত্র আলাপের যান্ত্রিক উপায় ?

CENTRAL LIBRARY

পিছন ফিরে গত ব্যপদেশ যেহেতু আর লভ্য নয়, তখন একজন আরেকজনের স্মৃতির আয়নায় নিজের স্মৃতির মুখ দেখে, এবং স্বস্তি বোধকরে, যদি হুবহু মেলে।

স্মৃতি যাচাই-এ স্থান মেলে, পাত্র ও হয়তো মেলে, কিন্তু মেলে না সেই কাল আর কালের মঞ্চে প্রবেশ-নিষ্ক্রমণের সূক্ষ্মযোজকে বসানো সেই স্থান আর সেই পাত্র।

২০১ মেঘ কী? মেঘ হচ্ছে মেঘ—শুধু ভাষাব্যবহারে এই উত্তর পুনরুক্তি হলো মাত্র, আমার জ্ঞান জন্মালো না।

আমি লাফাবু চিনি না। চিড়িয়াখানায় পাশের একজনকে আমি জিজ্ঞেস করলাম—ওটা কী? সে বললো 'ও একটা প্রাণী,' 'চারপায়ে খুব ছোটে' ··· ইত্যাদি আরো কতো বর্ণনা দিলো সে। ওর বাইরের রূপটাতো আমিও দেখেছি। তবু নাছোড়বান্দা জানতে চাইবো 'প্রাণীতো বুঝলাম, নাম নেই ওর?'

২০১১ সাদা কীরকম? না, দুধের মতো। শ্রোতার যদি এতেই আসক্তি মেটে, বুঝতে হবে দুধ সে চেনে একতমভাবে।

সাদাকে জানলে, সে জানবে কালো রঙ—কেননা শব্দ দুটি আলাদা। শব্দ দুটি (রঙ দুটি নয়) সে চিনলো কী করে?—রঙ দুটির মধ্যে দিয়ে এবং সমষ্টিসিদ্ধির যাচাই দিয়ে।

জ্ঞান এইভাবে সমর্থিত হলে বলা যাবে—বিশেষ ভাষা-গোষ্ঠীতে ওই দুটি রঙের ভেদজ্ঞান রয়েছে ওই দুই নামে।

২০২ নাম ও রূপ অভিন্ন কিন্তু একই নয়। 'একই'—এই ব্যাপার গণিতে '=(সমান)' চিহ্নে বোঝানো হয়। দুটি দ্রব্য একই হতে পারে, কিন্তু অভিন্ন নয় কখনো।

২০২১ নাম ও রূপ একে অন্যের সীমা নির্দেশ করে। কিন্তু ২+২=৪, x=y, মেঘ=মেঘ—এই উদাহরণগুলির কোনোটিতেই এ-পক্ষ ও পক্ষের সীমা নির্দেশ করে না।

( ধানক্ষেতকে ধানগাছের আলে বাঁধা যায় না। আগে অড়র গাছ লাগাতে হবে বরং। )

২০৩ স্মৃতিতে এক আদর্শ থেকে আরেক আদর্শকে আলাদা করে রাখবার জন্যে স্বতন্ত্র ধ্বনিরও আশ্রয় নিলাম। স্বতন্ত্র ধ্বনি ও ধ্বনি-সমবায় ছাড়া বাচনের কোনো অস্তিত্ব নেই।

কিন্তু ওই ধ্বনির সংবাদ আমার কণ্ঠে নেই, আছে কানে। স্পষ্ট বা আদুরে যে গলায়ই উচ্চারিত হোক, 'ল'-এর আওয়াজ আমার শ্রুতিপ্রসিদ্ধ আদর্শের সঙ্গে মিলবে, বক্তা যদি হয় আমারই স্বভাষী।

ধ্বনির এই শ্রাব্য প্রতীকই ধ্বাত। ( ব্যাকরণে আমরা এই আখ্যা ব্যবহার করবো। ) একই ভাষাগোষ্ঠীর প্রজারা ধ্বাতকে অনায়াসে ধ্বনিতে রূপান্তরিত করতে পারে।

২০৩১ যে-ভাবেই বলা যাক না কেন, ধ্বনির ইচ্ছাকৃত স্ফুটন ( ব্যাকরণে একেই আমরা 'স্ফোট' বলবো )' মানবগোষ্ঠীর সামান্য সম্পদ।

ভিন্ন ভিন্ন মানবগোষ্ঠীর—প্রাকৃতিক প্রতিবেশ, খাদ্যসংগ্রহ ও অন্যান্য ব্যবহারিক জীবন-যাপন প্রণালীর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে পৃথক পৃথক স্ফোট সৃষ্টি হয়েছে।

২০৩১১ কুকুরের একই ডাককে বাংলায় বলি 'ঘেউ ঘেউ,' ইংরেজেরা bow, wow' আর ফরাসীরা 'ona ona'। এরকম হলো কেন ?

অনুকরণে অনুকারকের উপলব্ধিই আসল। ধ্বনি 'x' হলেও তার আঘাত বাক্‌ন্যায় গোষ্ঠীভেদে w, b বা on।

বাক্-গোষ্ঠী তার ধ্বাত সম্পদের সঙ্গে মিলিয়ে গোষ্ঠীগণ্ডীর বাইরের ধ্বনিকে প্রকাশ করে।

বাংলাভাষী ধ্বন্যাত্মক শব্দে গুরু আওয়াজ বোঝাতে বর্গের চতুর্থ বর্ণ ব্যবহার করে এবং লঘু আওয়াজ বোঝাতে প্রথম বর্ণ। সেই জন্যে কুকুরের জোর ডাক 'ঘেউ ঘেউ' আর মৃদু আর্তনাদ 'কেঁউ কেঁউ' বা 'কুঁই কুঁই'।

২০৪ মানুষ যখন অন্য পশুর মতো শুধু প্রবৃত্তির বশে বাস করতো, ভাবা যায় তখন তারও বাক্ ছিলো না। বাক্ সমাজজীবনের অঙ্গ। জীবনধারণ প্রক্রিয়ায় একটি বিশেষ স্তরের ফসল।

২০৫ পশু থেকে মানুষে সেই বিরাট্ লাফটি দিতে কে আমাকে সাহায্য করেছিলো—অহঙ্কার না বাক্? জানি না, কোনটা আগে; খুব সম্ভব, ডিম-পাখি ন্যায় সম্পর্ক এ-দুয়ের মধ্যে। একটা ছাড়া আরেক-টার কথা ভাবতে পারি না। তবে বাক্সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তা দ্রুত পল্লবিত হয়েছিলো, এটা সহজেই অনুমেয়।

৩ ন্যায় ও বাক্প্রয়োগ ওতপ্রোত। কিন্তু, ন্যায়কে বাগাতিরিক্ত বিষয় হিসাবে প্রকাশ করা অসম্ভব। ঘুরিয়ে বলা যায়, ভাষার ন্যায় ও শুদ্ধ ন্যায় এক ও অভিন্ন।

৩০১ ভাষার ন্যায় আমরা ব্যাকৃত দেখি শব্দের মেলবন্ধনে, অন্বয়ে, যোগ্য-তায় ও বিষয়ীর বিষয়ে আসক্তিতে। এই ব্যাকৃতি দেখানো সম্ভব হলে সার্বভৌম ব্যাকরণ রচনাও সম্ভব।

৩০১১ ভাষার যান্ত্রিক ন্যায় ধরা আছে ভাষাগোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ ব্যাকরণ জ্ঞানে। এই যান্ত্রিকতা ছাড়া আমরা বক্তা শ্রোতার সংযোগ-সাধন করতে পারতাম না। গোষ্ঠীসিদ্ধিই ব্যবহারসিদ্ধি ও ন্যায়সিদ্ধি।

৩০২ ভাষা ও ন্যায়ের সম্পর্ক এইভাবে বললে বোধ হয় স্পষ্ট হবে; ভাষা ও ন্যায় উভয়েরই উপায় বা বাহন ভাষা কিন্তু উপেয় তৃতীয় কিছু। সম্পর্কটা অঙ্গাঙ্গী—যেমন হাত বাড়িয়ে কিছু ছুঁতে, ছুঁই আঙুল দিয়ে, যদিও কাজটা হাত ও আঙুলের যৌথ কৃতিত্ব, এবং কাজটা ছোঁয়া।

৩০৩ জাগতিক ব্যাপারের সঙ্গে ভাষার যে সম্পর্ক, ভাষার সঙ্গে ন্যায়েরও সেই সম্পর্ক। কোনোটা আগে নয় বা পরে নয়। টিউবওয়েলের কাজ যেমন বায়ুমোক্ষণ ও জলতোলা। শেষের কাজ দিয়েই আগেরটার অস্তিত্বস্বীকার। নৈয়ায়িকী বিন্যাসে ভাষা এই ভাবেই আমাদের কাছে জাগতিক ব্যাপার ব্যাখ্যা করে।

CENTRAL LIBRARY

৩০৪ আমার জগৎ গোষ্ঠীসিদ্ধ বাক্‌চিহ্নিত রূপের সমবায়। নানা ব্যপদেশে আমার ব্যবহার্য জগতে জড়ো হয়েছে এই সব রূপ।

৩০৫ আমার ব্যবহার্য জগৎ তাই গোষ্ঠীধৃত ও সসীম।

৩০৫০১ ব্যবহারিক প্রেক্ষিতই আমার ব্যপদেশ।

৩০৬ ব্যবহার্য বিষয় যখন পিণ্ডাকার সংজ্ঞারূপ পায় তখন সেটা ধারণা। ধারণায় সীমানির্দেশই আমার ব্যবহারের মোহর।

৩০৬১ যে ধারণা পরিসীম, অবয়বী—সেটির বাক্‌চিহ্নই নাম। অন্য অপরিসীম ধারণার জন্যে আছে আখ্যা।

৩০৬১১ যেখানে আমার বাক্‌চিহ্নিত ব্যবহার্য রূপ নেই সেই কাল্পনিক জগৎ আমি কী ভাবে তৈরি করবো? ঈশ্বরও আমার ভাষায় তাঁর জগৎ সৃষ্টি করবেন, তিনিই বা কী করে আমার বাক্‌ন্যায়অসিদ্ধ-জগতের স্রষ্টা হবেন?

৩০৬১২ "হাতের কাছে যা পাচ্ছি, ছুঁড়ে মারছি"—কী বোধ কাজ করছে এখানে? যা-কিছুই ছোঁড়া হোক, লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হবে, কোনোটাই হুস করে আকাশে উড়ে যাবে না। কিন্তু এমন একটা জগৎ যেখানে উড়ে যাওয়াটাই বিধি ··· ···না ঃ, বর্তমান জগতের বাক্‌ন্যায়ে ভাবতে পারিনা সেই ব্যপদেশ।

৩০৬১৩ দেখা যাচ্ছে, "নিত্য রূপের উৎস দ্রব্যের" [ ভিটগেনস্টাইন ] অভাব এই সব অসৃজ্য জগতের প্রতিবন্ধক নয়।

৩০৭ দ্রব্য স্বরূপী না আমার মানসরূপক—এই সনাতন দ্বন্দ্ব থেকে সমদূরে দাঁড়িয়ে আপনি বলছেন—"বিষয় পটবিম্বিত"।

৩০৮ কিন্তু, সামনে দূরে উপরে পাশে ডাইনে—এ সব পটের স্থানাঙ্ক নয়। ভাষার সহান্বয়ী তথ্য।

৩০৯ বাক্ প্ররোগে শব্দবিন্যাসের ক্রম ভাবুন ঃ

সর্বাগ্রে আছে বক্তা বা বিষয়ী। 'আমি তাকে বই দিলাম' এই বাক্যের গোড়ায় দাতার সুবুদ্ধি, তার পরে প্রাপকের উল্লেখ। প্রাপক কী পাবে, এবার বিবেচনা করতে পারি।

অপাদান অধিকরণের অগ্রে—যাত্রাবিন্দু অবশ্যই গন্তব্যের পূর্ববর্তী।

৩১০ বাক্‌মূল ন্যায়ের কল্যাণে আমরা ( যান্ত্রিক ব্যাকরণ সিদ্ধ ) বিদেশী ভাষা শিখি, বিদেশী ভাষায় লেখা গণিত ইত্যাদি বিজ্ঞানবাচী তথ্য-শাস্ত্র অবৈকল্পিকভাবেই বুঝতে পারি।

৩১০১ অন্যদিকে, নানা রকম তত্ত্বশাস্ত্রে প্রযুক্ত ভাষা প্রাতিস্বিক অহঙ্কারের নিপাতনে সিদ্ধ। এসব ক্ষেত্রে বক্তার প্রত্যাশা ও শ্রোতার উপলব্ধির সমীকরণ সম্ভব হয় না।

৩১০২ ভাষার সহান্বয়ী তথ্য যোগায় তৌলধারণা। প্রতীপের অভাব হলে তৌলধারণারও অভাব ঘটে। তৌল ন্যায়ে দুই প্রতীপের মাঝখানে থাকে তৌল সামান্য—আর এই প্রতীপ দুটি যান্ত্রিক ন্যায়ের দুই স্থির মেরু।

৩১২ নারীর সৌন্দর্য সম্পর্কে ভারতীয়দের ও চীনাদের মোটামুটি আদর্শ ধারণা আছে এবং আদর্শটি দুই দেশের ক্ষেত্রে ভিন্ন। আবার, ব্যক্তিগত অহঙ্কারও একই রমণীর সৌন্দর্যের তারতম্যের জন্যে দায়ী।

৩১২১ কিন্তু ব্যবহারিক জগতে যেহেতু গোষ্ঠীসিদ্ধির বাইরের ধারণা নির্বোধক, সেই জন্যে পূর্বোক্ত ব্যাপারে আমরা একটি তৌলসামান্য গড়ে নিয়েছি এবং বলছি—'রুচি'। এই আদর্শ বিশেষ স্থানকালের পরিসীমায় মাত্র কার্যকর।

সুন্দরী নারী আর এক মিটার কাপড়—এ দুইয়ের গুণ ব্যাখ্যানে পার্থক্য আছে অবশ্যই।

( যে সমাজে নারী মাত্রই পুরুষের কাম্য সেখানে রুচির বালাই নেই। সে-সমাজকে রুচিগোষ্ঠীর আমরা অসভ্যসমাজ বলবো। অতএব নির্ভয়ে বলা যায় অসভ্য সমাজে অহঙ্কার কম। )

৩১২২ লোকে বলে ছবির মতো সাজানো শহর, বাড়িঘর, রাস্তাঘাট ; কিন্তু একজনও বলেনা ছবির মতো নোংরা কলকাতা শহরটা। কারণ কী ? সুন্দরের ধারণা যেমন প্রতীকী, অসুন্দরের ধারণা ততোটাই

বিষয়াসক্ত। ছবির প্রতীকী ধারণার সঙ্গে সুন্দরের ধারণা সেই জন্যে খাপ খায়।

লোকটাকে ভালো বলা যায় না আবার মন্দও না, কী বলবো তবে? 'ভালো না' বলবো না, বলবো 'মন্দ না'। ভালোর নিষেধ সরাসরি মন্দে এসে ঠেকে, অর্থাৎ সু-এর ক্ষেত্রে অভাবটি প্রকট। (এই জন্যেই কি ব্রহ্মকে বলা হয় নির্গুণ?) কু-বিষয়ের জন্মকাহিনীর আদিব্যাপদেশ সু-এর নিষেধ—এমন ধারণা করা যায়।

৩১২২ নীতিতত্ত্বেও মন্দত্ব নীচত্ব যতোটা বিষয়াসক্ত, উল্টো গুণগুলি তেমনই প্রতীকী। সাধু বললে অসীম সাধুত্ব ভাবি না, ভাবি একটা আদর্শ সাধুত্ব—আর আদর্শ যে-কোনো ধারণার আপাতত সীমা।

৩১৩ আদ্যন্ত জগতের ধারণায় ব্যবহার করছি সান্ত ন্যায়, এবং বলছি এ আমার জ্ঞেয় জগৎ। অনাদ্যন্ত ধারণার জন্যে অনন্ত ন্যায়, কিন্তু তা সান্তন্যায়ের ধারণায় নির্বোধক।

৩১৪ সান্তন্যায়ের বিষয় খিল, যদিও কোন দিন সব নিঃশেষ করতে পারবো না। খিল মানে এই নয় যে আমি পর্যাপ্তির আল বাড়াতে পারবো না।

৩১৫ ভাষা কোনো ভাবেই অনন্তকে সরাসরি গ্রাহ্য বিষয় হিসাবে প্রকাশ করতে সক্ষম নয়।

অনন্তন্যায়ে সম্ভাবনা বলে কিছু নেই, যেহেতু অসম্ভব তার গণ্ডীনির্দেশ করে না।

৩১৫১ সান্ত ন্যায়ে সংখ্যা ক্রমশ ছোট হতে হতে '০' হয়ে যাবে, কিন্তু অনন্ত ন্যায়ে তা একেবারে ফুরিয়ে যাবে না। (জেনো-র শশকচ্ছপ ধাঁধাঁর মূলও এখানে। সব ধাঁধাঁই ভাষার যান্ত্রিক বিন্যাস।)

৩১৫১ সান্তন্যায়ে যদি ঈশ্বরকে ব্যাখ্যা করি তবে অবশ্যই জানতে চাইবো, তাঁর স্রষ্টা কে? অনন্তন্যায়ে সে-দায় নেই। অনন্তন্যায়ের প্রশ্রয়েই ভাষার সৃষ্টি 'নির্গুণ ব্রহ্ম'।

৩১৫৩ শ্রোতার ধৈর্য অথবা সময়ের কথা ভেবে আমরা হঠাৎ যেমন 'ইত্যাদি' বলে থামি। ব্যবহারিক 'অনাদি অনন্ত' ও অনেকটা সেই রকমের ব্যাপার।

৪০১ ভাষা ব্যবহারিক সম্পদ—মুখ্যত ও গৌণত যেভাবেই বিচার করি না কেন। ভাষার আদি প্রবর্তনাই হবে সব ব্যবহারিক ব্যপদেশের মূল কথা। পৃথিবীর কোনো ভাষাই আদিম পরিস্থিতিতে স্থির নেই, তাই আমরা যা করি, তা হচ্ছে একটা আনুমানিক পুনঃসংস্কার।

৪০২ ভাষার আদি প্রবর্তনা, ধরা যাক, সামান্যসংযোগ সাধন।

৪০২১ ভারতীয় পুরাণেতিহাসে সত্যযুগের উল্লেখ আছে। সে-যুগ সম্পর্কে এমন ধারণা দেওয়া হয় যে লোকে তখন যা বলতো তাই ফলতো। একটু ঘুরিয়ে আমরা অনুমান করতে পারি তখন যা কিছু ব্যপদেশ ছিলো সবই সাক্ষাৎ ভবকালের। কথা বলা ও কথা শোনা দুটোই ছিলো ফলিত ব্যাপার।

বাচন ও শ্রবণের পরিস্থিতি ছিলো এই রকম :

| প্রত্যাশা | আঘাত |
|---|---|
| বক্তা হুঙ্কার দিলো | শ্রোতা উৎকণ্ঠ হলো |
| 'অমুক কাজটা করো' | শ্রোতা কাজটি করলো |

অনুসিদ্ধান্ত : ক] কী বললে? শুনতে পাইনি; আবার বলো, ঠিক বুঝলাম না। —এই ধরনের বৃথা বাগ্‌ব্যবহারের কারণ ঘটবেনা, যেহেতু এই ধরনের কথাই তখনো সৃষ্টি হয়নি।

খ] আমি পারবো না—শ্রোতার পক্ষে এমন পরিস্থিতিও উদ্ভব হবে না। পারবার মতো কাজই তাকে বলা হবে।

গ] শ্রোতার কার্যসাধনেই বক্তার উপলব্ধি—শ্রোতা শুনেছে। অতএব শ্রুতি ও কান অভিন্ন।

৪০২২ শুশ্রূষা ও সেবা কেন সমার্থক তা উপরের বিশ্লেষণ থেকেই বোঝা যায়। সেবা-র সেবকভাব অবশ্য বর্ণভেদের রসদ, এবং এ-প্রসঙ্গ স্বতন্ত্রভাবে আলোচ্য।

৪০২৩ এখানে যে বলা হয় : সে আমার কথা শুনলোনা—তার তাৎপর্য 'সে কালা' নয় ; লক্ষ্যার্থ—শ্রুতির ফলিত দৃষ্টান্তের অভাব ।

বসার তাৎপর্য—'শুনেছো' ?—এই জিজ্ঞাসা নয়, শোনারও তাৎপর্য নয় 'শুনেছি'—এই উত্তর ।

'শুনেছি'-র জের বলে ভবিষ্যতে, অর্থাৎ পরে বলা অনুযায়ী শ্রুতিকে ফলশ্রুত করবো ।

৪০২৪ 'শুনলে, বুঝলে, জানলে, জানোতো' ইত্যাদি খণ্ডোক্তি মনোযোগ আকর্ষণের মাত্রা । সাড়া না মিললে আগের বলা কথা স্লেটের লেখার মতো মুছে দিয়ে নতুন করে বলবো—এই হচ্ছে অভিপ্রায় ।

৪০২৫ বৃথাশব্দ যতো বেড়েছে, অভিপ্রায় বেদনের কৌশলও বেড়েছে । শব্দের পৃথক ধ্বনির প্রতি মমতাও ক্ষীণ হয়ে এসেছে সঙ্গে সঙ্গে ।

৪০২৬ একদিকে শব্দস্ফীতি অন্যদিকে ভাবসংকোচন—ভাষার এই বিশেষণ সামান্যের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া অব্যাহত ।

'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে'-র উদো বুদো বিশেষ উদ্ভব বা বুধো নয় সামান্য উদো বুদো এবং গোটা উপাখ্যানটাই সামান্য গোঁজামিলের প্রতীক ।

৪০৩ 'কথাটা পেটে আসছে ( বা মনে আসছে ) মুখে আসছে না' —এমন পরিস্থিতির ব্যাপার বিশদ আলোচনা করেছেন ভিটগেনস্টাইন, কিন্তু তিনি ধরতে পারেন নি মুখে-না-আসা কথাটার, স্বরূপ কি ? কথাটা যখন পেটে ( বা মনে ) আসছে, তখন সেটা একটা পুরানো ব্যপদেশের স্মৃতি, মুখে আসছে না তার কারণ ব্যপদেশটি সংজ্ঞা রূপে আছে, একান্ত নামে নির্দিষ্ট হয়নি ।

৪০৩১ কিন্তু যখন বলি 'ব্যাপারটা বুঝেছি, কিন্তু ফোটাতে ( বা বোঝাতে ) পারছিনা', তখন বুঝতে হবে ব্যাপারটা সংজ্ঞা হিসেবেও নিরূপিত হয়নি । 'আবছা আবছা বুঝেছি' যেমন না-বোঝা বা ভুল বোঝার সুভাষণ, উপরের বক্তব্যটিও তেমনি ।

৪০৪ কোনো এক রূপের বৈশিষ্ট্য সামান্যে ভঙ্গানোই ভান । ব্যাপারটা

অহঙ্কার সাধ্য। তাই 'ভান করার আগে শিশুকে অনেক কিছু জানতে হয়' [ ভিটগেনস্টাইন ]।

৪০৫ একটি বাচ্চা মেয়ে বললে : বাবা বেলা যায়। —কোন নিপুণ চিত্রকরের, আঁকা 'বেলা যাওয়ার পট' বুঝি তার হাতে। আঘাতটা যে রূপেই আসুক ( বক্তা আঘাত করে বাক্‌রূপে, শ্রোতার বেদন হয় ) লালাবাবু বা ধোপার বেদন এক হয়নি।

এক জনের মনের পট অভিধেয়-সীমিত, অন্যজনের—ব্যাপ্ত ব্যঞ্জনাময়।

৪০৫১ ঠেক দিয়ে কথা বলার প্রসঙ্গ শোনা যায়, তখন বাচ্যার্থ ফেলে-আসা কালকে আক্রমণ করে।

৪০৫২ পড়ুয়া যখন পড়ে 'বর্গেজ্‌জ ল জল বা ড-য় শূন্য ড়-এ-কার ড়ে পড়ে'—তখন তার কানে ধ্বনি বাজেনা, অর্থের কাঙালও সে নয়। সে শুধু বানান মুখস্থ করে। যে-জলপড়া সে দেখে থাকে—এ তার থেকে স্বতন্ত্র। তাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হয় 'জলপড়ে' মানে 'জল পড়ে।

৪০৫৩ লক্ষ্য উপলক্ষ্য প্রসঙ্গ সংসর্গ ইত্যাদি দৃষ্টিকোণে যতোভাবে সীমার হের ফের করবো, বাক্ ও অর্থ ততোভাবে নিজেদের মধ্যে সংকেত বিনিময় করবে।

৪০৫৪ বিশেষ ভাষায় বিশেষ কাঠামো ভাষাগোষ্ঠীর সামান্য সম্পত্তি। সেই কারণেই অহঙ্কার একে একদিকে পুরোনো বলে ফেলে দিতে পারে না ; আবার, এই কাঠামোর অঙ্গীকারের ফলেই নিরাসক্ত বাক্‌বিন্যাসেরও মোটামুটি তাৎপর্য বোঝা যায়।

যেমন এই বাক্যটি ধরা যাক : ব্যাঙ সাপ ধরে খায়। বাক্যটি স্বীকৃত নিদর্শ অনুযায়ী ( চর্যাপদে অনুরূপ প্রয়োগ আছে )। কিন্তু আমরা বলবো হেঁয়ালি হলো কথাটা। হেঁয়ালি বলার লক্ষ্য আসক্তিবিরুদ্ধ বাগ্‌ব্যবহার।

যে-বাঙালী ব্যাঙ ও সাপের অর্থ জানে না সে এটাকে হেঁয়ালি

ভাববে না, ভাববে : ব্যাঙ নামক্ একটি খাদক সাপ নামক তার খাদ্য ধরে খায়। অতএব হেঁয়ালি বলা হলো ব্যবহারিক জ্ঞানের দিক থেকে।

আর একটি বাক্য : এটা হলে, সূর্য পশ্চিমে উঠবে। 'সূর্য পশ্চিমে উঠবে' —বাক্যাংশের খণ্ড তাৎপর্য এখানে লক্ষ্য নয়, বাক্যাংশটি 'এটা হলে'র সঙ্গে আসক্ত। আসক্তিগত তাৎপর্য 'অসম্ভাব্যতা'। পুরো বাক্যটির অর্থ : এটি হওয়া অসম্ভব।

৪০৫৫ পাগলের হাত-পা নাড়া দেখে বুঝবো ওর ভঙ্গীর সঙ্গে ভাবের যোগ্যতা নেই ; কিন্তু বুঝছি কারা ? —না-পাগলের দল।

৪০৬ ভাষাই আমাদের চিন্তা। ভাষার সংযোগ ছাড়া হাত পা-ও নাড়ানো চলে না। কিছু চিন্তা করছি বলার অর্থই ভাষার চাঙড় শব্দ নিয়ে সাজাচ্ছি।

৪০৬১ কাউকে প্রশ্ন করা যায়—হাইড্রোজেনের আপেক্ষিক গুরুত্ব কতো ? এ-প্রশ্নের জবাব আছে, সে দেবে। তাকেই যদি প্রশ্ন করি—লাল-এর আপেক্ষিক গুরুত্ব কতো ? সাজানোয় ভুল নেই। অতএব প্রশ্ন করতে পারি। তবে, প্রশ্ন বলতে যা বোঝায়, উত্তরের আকাঙ্ক্ষা —তা কিন্তু আমাকে জলাঞ্জলি দিতে হবে। উত্তরে সে হয়তো মুখ টিপে হাসবে। আমার প্রশ্নটি কি তবে নির্দেশ করে— মুখ টিপে হাসতে পারো ? বোধ হয় এইটি তার তাৎপর্য। আবার কাউকে যদি সরাসরি জিজ্ঞাসা করা হয়—মুখ টিপে হাসতে পারো ? উত্তরে সে হয় হ্যাঁ বলবে, নয় না। তা হলে সত্যিকারের অর্থ কোথায় আছে ? শব্দে, না বাক্যে, না আলোড়িত মগজে ?

৪০৭ মগজটা কি ? একাধারে ভাণ্ডার ও কারখানা। সিদ্ধ বিষয়ের জন্যে ভাণ্ডার আর সাধ্য বিষয়ের জন্যে কারখানা। আঘাতমাত্রই জোড়া-তালি হাতড়ানো আরম্ভ হয়ে যায়। প্রশ্ন উঠতে পারে সাধ্য বিষয়-গুলি কি ভাষা থেকে স্বতন্ত্র ? না। নিদর্শের সাদৃশ্যে সম্ভাব্যগুলি ধারণায় ধরা পড়ে। ব্যবহারিক আকার পায় ভাষায়। সিদ্ধি

নতুন সাধ্যের দরজা খুলে দেয়। বেরিয়ে আসে ব্যপদেশ অনুযায়ী নতুন সিদ্ধি।

৫ বাক্‌ব্যপদেশে বৃথাবাক্যের উৎপত্তি ও মিথ্যাব্যবহার সমকালীন। বাচনমাত্রেই শ্রোতার প্রতিক্রিয়া ছিলো বাক্‌ব্যবহারের আদি ব্যপদেশ। কল্পনাকেও এই কারণে সত্য বলে মনে করা হতো বা সত্য ও কল্পনার মধ্যে কোনো সীমারেখা টানা হতো না। বৃথা বাক্য ব্যবহার আদি মানুষের চোখে আশ্চর্য ব্যাপার।

মন্ত্রদ্রষ্টারা তাই কবি দ্রষ্টা মনীষী পরিভূ স্বয়ম্ভূ।

৫০০১ যাচাই হচ্ছে সত্যের নৈকষ্য, আর তা শুধু তখনই সম্ভব যখন বাচনের সীমা নির্দেশের জন্যে বাচিত বর্তমান। পিছন ফিরেও আর যার নাগাল পাবো না সেটাই অতীত।

সত্য অভিজ্ঞতার সঙ্গে যা মেলে না তা-ই অসত্য।

৫০১ আজ মিথ্যেও যেহেতু মানুষের ব্যবহারিক ব্যপদেশ, সেইজন্যে অ-সত্য এই নেতিপ্রতীকে তার কাজ চললো না, 'মিথ্যে' এই স্বতন্ত্র আখ্যা সে তৈরি করলো।

৫০১১ মিথ্যেটা এখন বাচনের বিশেষণ; মিথ্যে কাজ, মিথ্যে শোনা, মিথ্যে দেখা—এই সব ব্যপদেশ আমরা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করি।

বললাম, 'দোয়াতটা আনো তো', আনলো কলম। মিথ্যে হলো কাজটা? না, গোড়ায় ভাববো, শ্রোতা ভুল শুনেছে। সহযোগী মুদ্রায় চালিত হয়ে যদি কাজটা করে থাকে, তখন ভাবতে পারি লোকটা কালা।

কলম দেখিয়ে বললাম 'এটা কী', বললো দোয়াত। সে মিথ্যে বললো—এটা ভাবছি না, ভাবছি—সেই ওই শব্দ দু'টি কোন দুটো বস্তুর চিহ্ন জানে না (সমগ্রী দুটির ব্যবহার জানলেও জানতে পারে।)

মিথ্যুকের 'টাকাটা কালই দিয়ে দেবো' কথাটাকে কেউই প্রতিজ্ঞা বলে মানবে না, যদিও প্রতিজ্ঞার ছাঁচে ঢালাই করা কথাটা।

এই রকম ব্যপদেশ যারা যতো বেশি কাজে লাগায় তাদের ভাষায় সুভাষণ ততো বেশি ।

আমাদের চোখে যারা অসভ্য তাদের বাক্‌ব্যবহারে এর স্থান খুবই কম । এই বাক্‌ব্যবহারের গুণেই তারা সরল, সত্যবাদী ।

( ইংরাজীতে ধূর্ত শঠ রাজনীতির নাম ডিপ্লোম্যাসি । )

৫০২ গালগল্প রসিকতা ঠাট্টা ইত্যাদি সবই ভাষার ব্যপদেশ, কাজের নয় । কেউ 'চুম্বক কথা'র বদলে বললো 'চুম্বন কথা', কেউ জল চিবিয়ে খায়, কেউ ধানগাছের তক্তা চেরাই করে ··· এ ··· এই রকম কতো উপাখ্যান ।

আরো প্রসঙ্গ : বুঝছি, ক মিথ্যেকথা বলছেন, তবু সেই মিথ্যের প্রশ্রয়েই দুকথা বললাম । ( ভদ্রতা )

শীতকালে কেউ বললো 'গাছে কতো আম পেকেছে [illegible]'— উত্তরে বললাম 'তুই খা' । ( ঠাট্টা )

( যা দেখছি, তাতে সরকারগুলি কোনো দিন হয়তো বিরোধী-দের 'দিতে হবে', শ্লোগান আঁচ করে আগে থেকেই শ্লোগান দেবে— 'দেবো দেবো' । বাচ্চাকে যেমন অনায়াসে 'চাঁদ পেড়ে দেবো' বলি, এও প্রায় তেমনি ব্যবস্থা । )

একটা কথা চালু আছে : সোজা পড়ো উলটা সমঝো । অর্থাৎ নিহিতার্থ ব্যুৎপত্তির নঙ্‌ ।

৫০৩ 'লোকটা খুব আলাপী'—এ-কথার অর্থ কী ? স্পষ্টত, লোকটা বৃথা বাক্যব্যবহারে পটু ।

ইনিয়ে বিনিয়ে বলা, বানিয়ে বলা, রসিয়ে বলা, গুছিয়ে বলা —বলার রকমফের আছে এইসব, আর শোনার ?

উৎকর্ণ হয়ে শোনা, কান দিয়ে বা না-দিয়ে, মন দিয়ে বা না-দিয়ে শোনা ।

৫০৪ অভিজ্ঞতার কাল অতীত, বিশ্বাসের কাল সাধ্য বিষয়ের সিদ্ধির অপেক্ষায় ভবিষ্যতে ।

প্রত্যক্ষ পরোক্ষ অতীতের সারমর্ম আর অনুমান শুধুই বিশ্বাসের দিকে ঘাড় কাৎ করে আছে বিশ্বাস তাকে আমল দিক আর না দিক।

৫০৪১ বিশ্বাস বললে আস্তিক্য বোঝায়। কিন্তু কেন? (বিশ্বাস, অন্তত বাংলায়, আস্থারই প্রতিশব্দ।)

'বিশ্বাস করা' এমন এক ব্যাপদেশ যা বহু আদিমগোষ্ঠীর ভাষায় নেই। বিনিশ্চয়ের যাচাই যেখানে মেলে না, সেখানেই এই আপাতস্থিতি।

৫০৪২ বিশ্বাসের কি কোনো কাল আছে? যদি না থাকে, তবে কি ওটা ক্রিয়া? যদি থাকে, তবে কি একমাত্র নিত্যকাল?

না, বিশ্বাস তাৎক্ষণিক। 'আমি বিশ্বাস করতাম' উক্তিটি এখন যে করি না তারই সুভাষণ।

'আমি বিশ্বাস করবো'—এটা সব সময়ই অন্য কিছুর সাপেক্ষ। অর্থাৎ, এই ব্যাপদেশ ভাষায় এই রকম ভাবে ফোটাই: আমি বিশ্বাস করবো যদি ··· ···।

বিশ্বাস দিয়ে কতো রকমের বাক্য হতে পারে ভাবো একবার!

৫০৫ আমি এমন স্বপ্নও দেখতে পারি:

আমি একটা গাছে চড়লাম, সেখানে বসে এক পেয়ালা চা খেতে বসে গেলাম (কে দিলো জানি না); চায়ের ভিতর থেকে ফুড়ুৎ করে একটা পাখি উড়ে গেলো। আমি ওটাকে ধরতে গিয়ে (হাতে এখন চায়ের কাপ নেই, কে নিয়ে নিয়েছে জানি না) পড়ে যেতেই ঘুম ভেঙে গেলো।

তোমার মুখ ফসকে বেরিয়ে আসবে—কী অদ্ভুত স্বপ্ন। অদ্ভুত? —কারণ এখানে 'তা-হয় না'-কে আমল না দিয়ে বাক্য সাজিয়েছি। তুমি তাহলে 'স্বাভাবিক' এমন স্বপ্নও ভেবেছো?

জেগে যদি সেই স্বাভাবিক স্বপ্ন দেখি, তাকেই বলা যায় কল্পনা।

৫০৬ স্বপ্নের আবার সত্যি মিথ্যে কি ? অবশ্য স্বপ্নদ্রষ্ট র স্বভাব জেনে এ-পর্যন্ত বলতে পারি, লোকটা বানিয়ে বলছে। ( বাড়িয়ে কমিয়ে ঘুরিয়ে, রঙ ফলিয়ে—সবই বানানো।)

৫০৬১ এক জনের স্বপ্ন আরেক জনকে দেখানো বা তাকে দিয়ে পরখ করানো যায় না। তবু, স্বপ্ন দেখাটা সত্যি কি মিথ্যে সে তর্ক উঠবে না। জীবনে যে স্বপ্ন দেখেনি সেও বাবার মুখে ঠাকুমার 'গোলাপসুন্দরী' নামের মতো স্বপ্নের অস্তিত্ব মানবে। এখানে 'স্বপ্ন' তার কাছে ব্যাখ্যাশ্রয়ী ব্যাপার, কিন্তু অর্থবহ বা নিরর্থক নয়।

৫০৭ ভিটগেনস্টাইন প্রশ্ন তুলেছেন কুকুর কি কখনো আশা করে ? এ-প্রশ্ন মনুষ্যেতর সব প্রাণী সম্পর্কেই।

প্রথমে দেখা যাক আশা এই ব্যপদেশের কাল কি ? যে বিন্দুতে কুকুরটি বর্তমান আশার উপলক্ষ্যটি অবশ্যই তার পরবর্তী। এই হিসেবে আশা করা ভবিষ্যৎ ব্যপদেশ।

ভবিষ্যৎ ব্যপদেশ বলেই, আশা ফলতেও পারে, না-ও পারে। সেই জন্যে আশা গোত্রের অনেক শব্দ ভাষায় আছে: আশা, দুরাশা, নিরাশা, হতাশা ইত্যাদি।

একটা কুকুর কাছেই গাছতলায় শুয়ে ছিলো। হঠাৎ সে উঠে পাশের বাড়ির আস্তাকুড়ে কিছু খুঁজতে গেলো। এটাকে কি আশা করা বলবো ? সংকীর্ণ অর্থে হয়তো বলে থাকি। কিন্তু সেটা আরোপ করা ধারণা। খাদ্য অন্বেষণ সহজাত প্রবৃত্তি বা জাতি সংস্কার আর নিকটভবিষ্যৎ বর্তমানেরই অঙ্গ।

৫০৭১ আশাটা আমরা ব্যাপকতর অর্থে প্রয়োগ করি। মুদি আশা করে না সর্ষের তেল ব্ল্যাক করে সে লাখপতি হবে। সে বরং স্বপ্ন ( বা খোয়াব ) দেখতে পারে। মানুষের আশায় সংসর্গ সংস্কার কাজ করে।

৫০৮০১ ঋতুকাল ছাড়া মনুষ্যেতর প্রাণী মৈথুন করে না। মানুষের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রয়োজনের ঋতুকাল নেই। ভবিষ্যৎ প্রয়োজনকে সে

বর্তমানে উত্তেজিত করতে পারে, মনুষ্যেতর প্রাণী তা পারে না।

এখান থেকে এমনও সিদ্ধান্ত করা যায় : যখন মানুষের ভাষায় ভবিষ্যৎকাল ছিলো না তখন ঋতুকাল ছাড়া সে মৈথুন করতো না। আশাও ছিলো না—শিকারের প্রহরণ সে শানিত করেনি তখনো। 'মন'—নামক স্বতন্ত্র সংস্কারও তার ছিলো না

৫০৮০২ মৌমাছি ও পিঁপড়ে খাদ্য সঞ্চয় করে। বর্তমানের কর্মপ্রবর্তনাই তাদের সঞ্চয়ের নিয়ামক। কৃপণ যেমন জানে না কেন সে টাকা জমাচ্ছে। বর্তমানের দায়ভাগ অনুসারে চাষী মাঠে যায়, কাজ করে, দিনান্তে ঘরে ফেরে, রাত্রে স্ত্রী-সহবাস করে আবার পরদিন মাঠে যায়।

৫০৯ ভবিষ্যতের মধ্যে 'ঈষ্' ( ইচ্ছা করা ) লুকিয়ে আছে। ইচ্ছায় আত্মকর্তৃত্ব আছে, আশায় সেটা নেই।

৫১০১ গল্প উপন্যাসের আখ্যানকে গাঁজাখুরি পর্যন্ত বলতে পারি কিন্তু মিথ্যা বলতে পারি না ; লেখকেরা বাস্তব জগতের সিদ্ধ বিষয়ের বাইরে যান না। কল্পনা যে-পর্যন্ত না মিথ্যা ( আবার রসের দিক থেকে যে পর্যন্ত না সত্য এটা বলাই বোধ হয় বাঞ্ছনীয়), ততোক্ষণ সেই কল্পনা সাহিত্যের উপাদান।

৫১০২ ইতিহাস কখনো সাহিত্য হতে পারে না। 'ছিলো' বস্তুটি সত্য বলেই তার অতীতকাল। কোনো ঘটনা মিথ্যেও হতে পারে কিন্তু এই মিথ্যে 'ইতি হ আস' এই ধারণার মধ্যে নেই, আছে ঘটনার উপস্থাপনে। কিন্তু সাহিত্য কাল্পনিক। ইতিহাসে সাহিত্য আরোপ করার অর্থ বাস্তব চরিত্রে কাল্পনিক গুণ বা দোষ আরোপ করা। তবু ইতিহাস কখনো যথার্থ হয় না। কারণ তখনকার পাত্রের মনের খবর নিই এখনকার পাত্রের মন দিয়ে। এইটেই ইতিহাসের দর্শন, অন্যতর দর্শন খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক। রাজার ইতিহাস, প্রজার ইতিহাস, দেশের ইতিহাস, জাতির ইতিহাস এই রকম ভাগ ভাগ

করা ইতিহাস হতে পারে। তত্ত্বেরও ইতিহাস হতে পারে, কিন্তু তত্ত্ববিকাশক ইতিহাস কস্মিনকালেও নয়।

৫১১ যে-সব কথার মুখ ভবিষ্যতের দিকে ফেরানো আমরা শুধু সেই সব কথাই চিন্তা করি।

পর্যালোচনারও অন্যতম উদ্দেশ্য ভবিষ্যৎ নির্দেশ।

অতএব ভাবা যেতে পারে, এমন একটা কাল ছিলো মানুষ যখন চিন্তা করতো না।

৫১২ চিন্তার বিষয়বস্তু স্মৃতি হতে পারে তখনই, যখন স্মরণীয় বস্তুটি আমার অভিলাষিত।

অভিলাষ, বিশ্বাস, আশা একান্তই চলমান বিন্দুর সেই পার থেকে সংগৃহীত সামগ্রী, দুঃশাসনের আকর্ষণের বাইরে থাকা দ্রৌপদীর শাড়ী আছে যেখানে শাশ্বত যোগানদারের হাতে। যে-ক্লান্তিতে আকর্ষণ থামবে, থামবে তাতে যোগানও।

৬০১ সংখ্যা ও গণিতের ভিত্তি ব্যাখ্যানে গণিতজ্ঞরা শেষপর্যন্ত 'আমরা এরকম মানছি' বলে ক্ষান্ত হয়েছেন, কেন না 'কেন এরকম মানবো' এই গোঁ থেকেই তাঁদের অনুসন্ধানের সূত্রপাত। আসল সমস্যা 'কেন এরকম মানতে হচ্ছে' তার গোড়াপত্তন করা।

৬০১১ দ্রব্যের জন্যেই সংখ্যা, আবার যে দ্রব্য খণ্ড খণ্ড করে দেখা যায় না তাকে সংখ্যায় গুণিনা। কখনো বলি কি—একটা জল বা একটা বালি? গুণতে হলে বিন্দু বা কণা বা ঐজাতীয় পরিসীমার ছাঁচে ঢেলে নিই এদের।

৬০১২ সংস্কৃতে দুটো কথা আছে—কতর ও কতম। 'তর' ও 'তম'-র মোটামুটি আদিম অর্থ এখান থেকে উদ্ধার করতে পারি। নির্দিষ্ট কিছুর বাইরে অন্য কিছুকে 'কতর' দিয়ে খুঁজি, আর 'কতম' একটিই যেটি নির্দিষ্ট করা দরকার।

উত্তীর্ণ হওয়ার ধারণাই 'তর' আর 'তম' হচ্ছে স্থিতি।

'তর' 'তম' ও 'তিন'-এর ধারণার উৎস মনে হয় একই

ব্যপদেশ। ভাবা যাক একটা নদী—তার তিন পৃথক অংশ-এ-পার, জল ও ও-পার। ওপার তাই ত্রিতম ( বা তৃতীয়ও ) বটে। ( 'তীর্থ' কি তীরস্থ অর্থ বহন করে না ? )

৬০২ যুগপৎ দুইস্থানে একটি বস্তু থাকতে পারে না, এখান থেকেই গতির ধারণার জন্ম। গতি শুধু সরণেরই নয়, কালক্ষয়েরও ইঙ্গিত।

৬০২০১ বনে ঢুকে এই-একটা-গাছ-এটা প্রথম। এই-আরেকটা-এটা দ্বিতীয় ··· এই রকম করে পাঁচটি বিচ্ছিন্ন গাছ আমি পর্যায়ক্রমে চিহ্নিত করলাম। আবার, পাঁচটি গাছের কালক্রমিক আয়তনকে সমবেত করেও দেখতে পারি।

শিশুকে অঙ্ক বোঝাতে এভাবেই আমরা সামগ্রী ব্যবহার করি।

৬০২০২ রাশি সংখ্যার ধারণা অবশ্য তম-সংখ্যার ধারণার পরবর্তী। কালের ব্যাপারে হোপী-ভাষাগোষ্ঠীর লোকেরা রাশি সংখ্যার বদলে তম-ধারণা ব্যবহার করে। 'সে এখানে দশদিন এখানে ছিলো' না বলে, তারা বলে 'একাদশ দিনে সে চলে গেছে'। [ লী হোর্ফ ]

৬০৩ একের দুই অর্ধাংশ হিসাবে আদি আর্যভাষীরা দ্বিকে দেখতো, সেই কারণেই দ্বিবচনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। একের স্যামান্য দুই অংশে বিভাজনই কি ও এক বলতে তাই অসামান্য বোঝায়। সামান্যের অভাব হলে সংখ্যার ডাকই পড়তো না। সামান্যত্ব ন্যায়ের সৃষ্টি নয়, যেমন ভেবেছেন রাসেল র‍্যামজে।

( আমার ধারণা, একত্ববাচক শব্দগুলি আর্যভাষায় অন্যান্য সংখ্যার তুলনায় অর্বাচীন )

৬০৪ একের স্থৈতিক মান একতম, দ্বিতম বলতে একতমের স্মৃতি কাজ করে। ত্রিতম বলতে একতম ও দ্বিতমের স্মৃতি কাজ করে। এই ভাবে, উত্তরোত্তর তম-সংখ্যা দ্রব্যকে বিশিষ্ট করার জন্যে সৃষ্ট, আর তর-ভাব স্মৃতির উদ্বোধক।

৬০৫ যে-কোনো সসীম সংখ্যার আছে-নেই ধারণাই শূন্য। শূন্য কোনো সসীম

সংখ্যার অন্যতম নয়, সেই জন্যে রোমক ও গ্রীক সভ্যতা শূন্যের ধারণা বাদ দিয়েই কাজ চালিয়েছে।

কিন্তু তারা কি ঋণ শোধ হয়ে গেলেও অধমর্ণকে বিব্রত করতো? নিশ্চয়ই না, তারা তাদের জমা খরচের খাতায় ব্যপদেশটি বোঝাতে শব্দ বা শব্দ সমবায় ব্যবহার করতো।

শূন্যের তো স্থান কাল পরিসীমা নেই, তবে তার ধারণার উদ্বোধক হলো কি করে গণিতে?

মাঠে একটা পাইপ পড়ে আছে। চাপা পড়া জায়গার একটা আদ্যন্ত পরিসীমা আছে। পাইপ যেই তুলে নেওয়া হলো, মাঠ আবার ফাঁকা হয়ে গেলো। অথবা, শ্লেটে একটা এক বিঘৎ রেখা টানা হলো, আবার মুছে দেওয়া হলো নেতি টেনে। পরে হয়তো বলবো এখানে ছিলো একটা পাইপ, কি, শ্লেটে ছিলো এক-বিঘৎ একটা রেখা। এই স্মৃতির সীমান্তে আছে শূন্য—'নেই' শব্দে যেমন 'আজো ছিলো' এই ব্যপদেশ বোঝায়।

৬০৬ যখন বলি ০ ও x এর ব্যবধান সর্ববৃহৎ। আর বৃহত্তর ব্যবধান হয় না, তখন ০ ন্যূনতম ও x বৃহত্তম ব্যবহারিক সংখ্যার প্রতীক।

৬০৬০১ দশ পাতা জুড়ে যদি একটা রাশি লেখা হয়, পড়তে পারবো না সংখ্যাটি কতো। রাশিটি ভাঁজ করে রাখায় মতো একক আমার জানা নেই। আবার, আলোকবর্ষের চেয়ে বড়ো মাপের একক দিয়ে যদি সংখ্যাটি ভাঁজও করি। তবু রাশিটির পরিমাণজ্ঞান হবে না। শব্দজ্ঞান হবে মাত্র।

৬০৭ একটা বইয়ে সুবীর, হরেন ও সুলতার কথা আছে। নাম তিনটির বদলে যথাক্রমে xyz বসিয়ে যদি বইটি পুনর্লেখন করো এবং পড়বার সময় যদি সংকেতিক নামগুলো উচ্চারণ করো। তবে xyz হবে ওই নাম তিনটির শর্টহ্যাণ্ড। (পড়বার সময়ও যদি xyz পড়ো তবে এই সংকেতগুলো বিকল্প নাম হয়ে দাঁড়াবে।)

কিন্তু গণিতের xyz প্রতীক এবং বিন্যুতন। ( ইউক্লীডীয় বিন্দুর সঙ্গে স্থান ও কালবাচক শব্দের তন-প্রত্যয় যোগ করে 'বিন্যুতন'। )

৭ ফ্রেগের কথাই হয়তো ঠিক, চৌহদ্দি ছাড়া ধারণার কোনো অস্তিত্ব নেই। কিন্তু, চৌহদ্দির সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক কেমন ?

একজনকে বললাম 'ঐখানে দাঁড়া,' আঙুল দিয়ে দেখালাম জায়গাটা। দাঁড়ানোর অবস্থান মনঃপূত না হলে বলবো 'একটু ডাইনে সরে, কি বাঁয়ে সরে, এগিয়ে কি পিছিয়ে দাঁড়া।' চৌহদ্দিটা বাইরে না থাকলেও, দেখা যাচ্ছে, আমার মনের মধ্যে আছে।

একটি দৃশ্য :

টেবিলের সামনে বসে আছি, আর আমার সামনের দেওয়াল ছ-হাত দূরে। কাউকে বললাম 'সামনে এসে দাঁড়া'। সে আমার সামনের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালো। বললাম, 'সামনে আয়'। গুটি গুটি এগোতে লাগলো, আমিও বলতে লাগলাম 'আরো, আরো, আরো'। টেবিলের ধারে পৌঁছাতেই বললাম 'ব্যস'। ( ঠাট্টার ব্যাপার হলে, 'আরো, আরো' চালিয়ে যেতাম, যদিও জানি আর এগোবার উপায় নেই। ) তাহলে, আমার উদ্দিষ্ট 'সামনে'-র একটা নির্দিষ্ট অবস্থান আছে।

অবস্থা পূর্ববৎ। সামনে একজন আমার দিকে পিছন ফিরে আছে ; বললাম 'মুখ ফেরা'। পশ্চিমে মুখ ছিলো, ফেরালো উত্তরে। আমি বললাম, 'না, আমার দিকে' ; সে আমার দিকে অর্থাৎ পুবে ফিরলো। আমি কি গোড়াতেই এটা চাইনি, না, পরে মত বদলেছি ? আরেকজনকে একই ভাবে, বললাম, 'মুখ ফেরা'। সে একবারেই আমার দিকে মুখ ফেরালো। এবার ? সে কি জানতো—আমি এটাই চাইছি, বা প্রথমে চাইনি কিন্তু পরে চাইতাম ? না কি, কিছু না ভেবেই সে ফিরেছে, বা চেয়েছিলো অন্যদিকে মুখ ফেরাতে। পরে মত বদলেছে ?

CENTRAL LIBRARY

৭০১ প্রথম ব্যক্তি আমার চোখে বেয়াড়া, দ্বিতীয় ব্যক্তি সুবোধ। প্রথম ব্যক্তি টালবাহানা করেছে, দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রবৃত্তিবশে সামনে ফিরেছে।

৭০২ প্রবৃত্তির আওতার বাইরে যেতে চায় যারা : বেয়াড়া, তার্কিক, দাম্ভিক, অহঙ্কারী, কবি-লেখক-শিল্পী—কতোরকম দোষ আর গুণের অধিকারী এরা।

৭০৩ আদি ব্যপদেশগুলি, খুব সম্ভব, নিয়তি-নিয়মিত ; এর পরে আমরা যা ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছি সেই সব ব্যপদেশ নিয়তিকে ঘোরাবার জন্যে টালবাহানা।

৭০৪ যখন কাউকে বেয়াড়া বলি, বলে কি ভাবি—ঠিক বললাম তো ? সঠিক শব্দের জন্যে মগজের ভাণ্ডার হাতড়াতে থাকি ?

এমন একটা কুঠুরির কথা ভাবা যাক, যেখানে ঢুকে ব্যপদেশটি আওড়ালে সঠিক শব্দটি বেড়িয়ে আসে। মগজের মধ্যে কি আছে এমন কুঠুরি ?

তাছাড়া, কুঠুরিই যে সঠিক বলে—এমন নিশ্চয়তাই বা পেলাম কোথায় ?

৭০৫ না, আমাকে কর্তৃত্ব মানতেই হয়।

উপনিষদে আছে, ভয়ে সূর্য চন্দ্র দেবতারা নিয়মিত কর্তব্য পালনে রত। এঁরা আজ্ঞাবহ। যিনি নিয়মিত ভয় দেখান, তিনি ? সূর্য সময়মতো উঠতে ভুলে গেলে কি তিনি 'এবারের মতো থাক' বলে ছেড়ে দেবেন ? না, এই হচ্ছে আদর্শ আজ্ঞাকারী-আজ্ঞাবহ সম্পর্ক।

আজ্ঞাকারী-আজ্ঞাবহ সম্পর্কে এইরকম যখন কোনো ছেদ নেই, তখনই ব্যাপারটা যান্ত্রিক।

৭০৮১ ভাষার খেলা নিয়ে ভিটগেনস্টাইন প্রচুর মেতেছেন। কিন্তু এর পিছনে খেলোয়াড়ের প্রবর্তনা কি সেটা ভেবেছেন অল্পই।

প্রতিটি খেলোয়াড় তার নির্দিষ্ট নিয়ম মানবে, এইটেই খেলার

শৃঙ্খলা। খেলার যেমন নিয়ম আছে, নিয়মভঙ্গেরও যথাবিহিত শাস্তি আছে। যখন-যে-খুশি-যেভাবে-হোক কোনো খেলা নয়। এরকম খেলা যদি কল্পনা করি, তবে সে-খেলায় দর্শকের কোনো ভূমিকা নেই। প্রত্যুত, কোনো পরিসীমা নেই এমন খেলা--যেমন ছকহীন দাবা, লুডো বা গণ্ডীঘেরা মাঠ ছাড়া নানারকম বল খেলা—আমরা ভাবতেই পারি না।

খেলার মধ্যে ব্যাপদেশ নিত্যনতুন। খিলসংখ্যক সিদ্ধ ব্যাপদেশ নিয়ে খেলোয়াড়ের অভাবিত ব্যাপদেশগুলিও সামলাবে। বল পায়ে পাচ্ছিনা বলে হাত দিয়ে ধরবো, তা চলে না। এমন কি বিপক্ষের সুবিধায় গেলেও না।

ভাষার খেলায়ও এই রকম সিদ্ধ পদ্ধতি আছে যা ব্যাকরণের সম্পত্তি।

৭০৮২ একটা বাচ্চা এক কোণে বসে এটা সেটা করছে। জিজ্ঞাসা করলাম-কী করছিস ওখানে? জবাব দিলো—খেলা করছি: উপরে যে-খেলার কথা বলা হলো,এ-ও কি তা-ই? সে কি নিয়ম মানছে? নিয়ম ভাঙলে, নিজে থেকে শাস্তি নিচ্ছে?

এক সময় পুতুলকে কাৎ করে রেখে, অন্য কিছুর দিকে মনোযোগ দিলো সে। পরে আবার পুতুলটির দিকে ফিরে শাসন করছে 'ঘুমিয়ে পড়েছিস কেন?'

বাক্‌ব্যবহারের মহড়া দিচ্ছে সে; খেলার এটাই আদি ব্যাপদেশ ভাবা যায়।

না, বাচ্চার খেলার কোনো ফ্রেম নেই; ছবি বাইরে যাচ্ছে কিনা এ-বিচার তার খেলায় প্রযোজ্য নয়।

৭০৮৩ একা-একা খেলা যায়? পক্ষ প্রতিপক্ষ ও পক্ষপাতের যে ধারণা 'খেলা' বলতে আসে, তার এখানে জায়গা হচ্ছে না। দলীয় পক্ষপাতও একধরনের বিধি।

মানব সমাজের অনেক গুণই পক্ষপাত দুষ্ট—যেমন স্নেহ মমতা

CENTRAL LIBRARY

প্রেম। প্লেটো ব্যষ্টি থেকে পক্ষপাত দূর করতে গিয়ে সমষ্টির দিকেই পক্ষপাত দেখালেন। সুস্থ সবল নাগরিকের প্রতি পক্ষপাতে বিকলাঙ্গ দুর্বল সন্তানকে বাঁচতে না দেওয়াই ছিলো স্পার্টানদের বিধি। পক্ষপাত নেই অথচ সমাজ আছে, এমনটি অকল্পনীয়।

৭০৮৩১ একা-একা যদি খেলেই কেউ, বিপক্ষ সাজাবে নিয়তিকে। ছন্দ মিল ইত্যাদির খেলায় নিয়তিকে যে যতো খেলাতে পারে, সে ততো বড়ো খেলোয়াড়।

---

বাঁ দিক থেকে ১ম সংখ্যাটি মোটামুটি বিষয় ভাগ, তার পরের দুটি মূল বক্তব্য, পরের দুটি বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা কোন বিশেষ ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের ফলশ্রুতি কেমন দাঁড়াতে পারে সেই কথা বোঝাবে। হয়তো সর্বত্র এই স্কিম কাজ করে নি, সেটা সংখ্যা ব্যবহারের দোষ হলেও হতে পারে, তবে আমার পারম্পর্যহীন উক্তিও সেখানে দায়ী।

CENTRAL LIBRARY

# অতীন্দ্রিয় পাঠক

## শব্দ কোথা থেকে কেন সাহিত্যে

ভাষা বলতে আমরা এইরকম বুঝি, যেমন, বাংলাদেশের লোকের বাংলা ভাষা, ইংরাজদের ইংরাজী ভাষা। অর্থাৎ বাঙালীরা একটি জাতি, তাদের সকলে সময়ের সাথে সাথে পারস্পরিক বোঝাপড়ায় কিছু কিছু শব্দ, শব্দের সমাহার, শব্দের প্রয়োগ—এসবের সাহায্যে এমন একটি মাধ্যম তৈরী করে নিয়েছেন যাতে নিজেদের মধ্যে স্বচ্ছন্দে ভাব বিনিময় করতে পারেন। শুধুমাত্র শব্দ এবং তার প্রয়োগে এইভাবে একটি সুষ্ঠু মানসিক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন হতে পারে। এই মাধ্যমকে সেই জাতির ভাষা বলে আখ্যা দেওয়া হয়। ভাব বিনিময়, মানসিক যোগাযোগ এসব ঘটে এবং এর ফলে ভাষা তার শব্দসমূহের মধ্যে সেই জাতির সংস্কৃতিকে বহন করে চলে।

গভীর অর্থে ভাষায় যে তত্ত্বগত দিক তাকে এখন এড়িয়ে যাওয়া যাক। 'ভাষা' এই শব্দটির অর্থগত দিক দেখলে, জ্যোতিতে যা অবগাহন করে ; এবং জ্যোতি অর্থে প্রকাশ। অর্থাৎ যা প্রকাশিত হোল তার মাধ্যম ভাষা। ভাষা ছাড়া প্রকাশের আরো অনেক মাধ্যম আছে। অবশ্য প্রাচীনতম হোল এই ভাষাই। ভাষা ছাড়া আর যেসব মাধ্যম আছে সেগুলি সবকটা মানসিক, একমাত্র ভাষা দৈহিক মাধাম। যেহেতু তা দৈহিক এবং প্রাচীনতম, তাই, একটি জাতির সমস্ত রকম প্রকাশের মধ্যে এর প্রকাশে সবচেয়ে বেশী তীব্রতা।

জন্মগ্রহণের মুহূর্ত থেকে আমাদের সামনে যে পারিপার্শ্বিক, যে পৃথিবী দাঁড়িয়ে থাকে, চলাফেরা করে, তার সাথে যোগস্থাপনের জন্যে ব্যাকুলভাবে কাজ করে, সেই যোগস্থাপন হয় শব্দের মাধ্যমে। সেই শব্দের অর্থ না থাকতে পারে কিন্তু কিছু যে প্রকাশ করে এবং কিছু একটা যোগাযোগ স্থাপিত হয়, এটা ঘটনা। সে সময় অনুভূতি যত দুর্বল থাক তা প্রকাশ হতে হবে এবং অক্ষমতা সেই প্রকাশের মাধ্যমকে তীব্রতর করে তোলে।

ক্রমশ এই অনুভব গাঢ় হয়। অর্থাৎ আরো স্পষ্ট হয়। যা প্রকৃত প্রকাশ দাবী করে। অনুভূতি পরিবহন করতে পারে এমন কিছু খুঁজতে খুঁজতে। আমাদের আদিমতম প্রকাশ যা জন্মের মুহূর্ত থেকে আমরা ব্যবহার করছি তা নেহাতই দৈহিক। কারণ মানসিক বিকাশ তখনো ঘটে নি। শব্দকে আমরা আশ্রয় করি। আমাদের অনুভূতি আরো সূক্ষ্ম হতে হতে মানসিক বিকাশ ঘটতে থাকে। এই মানসিক বিকাশ তখন দৈহিক মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রিত করে মার্জিত করে আরো সূক্ষ্ম অনুভূতি পরিবাহী করে তোলে। এটা ঘটে পারস্পরিক বোঝাপোড়ার মানসিক আদানপ্রদানের সূত্রে। ক্রমশ এভাবে একটি ভাষার জন্ম হয় এবং এইভাবে সেই ভাষা ক্রমে আরো আধুনিক হয়ে ওঠে।

সমস্ত অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম খোঁজে না। যা অসহনীয়, যা ধারণ করা যাচ্ছে না তা প্রকাশ হতে ব্যাকুল হয়। যখন এমন অবস্থা যে কোন অনুভূতি অসহনীয় অর্থাৎ অনুভব হওয়া সবে সুরু অর্থাৎ যে কোন অনুভব নতুন স্বাদের তাই বিচিত্র এবং অসহনীয় যেমন একটি শিশু খিদে পেলে বা অস্বস্তি হলে বা ঘুমোতে চাইলে, জন্ম থেকে প্রকাশের যে উপায় রপ্ত করছে সে, অনুভূতি হওয়ামাত্র চিৎকার জুড়ে দেয়। এবং সেই প্রকাশ ঘটতে থাকে যতক্ষণ না অনুভবের নিবৃত্তি হচ্ছে।

ক্রমে অনুভবের বিষয় বাড়ে। পরিধি বাড়তে থাকে। মানসিক বিকাশের সাথে সাথে দৈহিক অনুভূতির ওপর তার প্রভাব বাড়ে। অনুভূতি ধারণ করবার শক্তি আসে এবং তার সীমা ক্রমে আরও বিস্তৃত হয়। অনুভবের প্রায় সবটা গ্রহণ করার। কিছু অংশ হয়তো অনিবার্য প্রকাশ হয়ে

CENTRAL LIBRARY

পড়ে। এবং অধিকাংশ প্রকাশ অনুভবকে নিজের ভেতর উপযোগী গঠন করে সৃষ্টি করা। এই সব বুঝতে পারা যায় ক্রমশ। এই প্রক্রিয়ায় শব্দ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হয়। প্রকাশের জন্য উপযুক্ত শব্দ নির্বাচিত হয়। একটি জাতির অন্তর্গত সকলে নিজেদের একাকীত্ব দূর করার জন্যে, পারস্পরিক বিনিময় এবং যোগাযোগের জন্যে শব্দসমূহ তাদের উচ্চারণসমেত সমন্বয়ে একটি ভাষার মাধ্যমে নিজেদের স্থাপন করেন।

কিন্তু ভাষার মাধ্যমে একটি জাতির অনুভূতির সঠিক প্রকাশ হয় না। হয়তো অনেকটা হয়। আরো অন্যান্য সব মাধ্যম আছে যার মধ্যে আমরা আমাদের আদানপ্রদান করি, আমাদের প্রকাশ করি। যেমন রঙ, সুর, গতি ইত্যাদি। এইসব প্রকাশ ভাষার মত জাতির সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে ওঠে, বিনিময়ের অঙ্গ হয়ে ওঠে। এদের ওপর আয়ত্ত এলে অনুভূতির নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। কারণ রঙের অনুভূতি বা সুরের বা গতির অনুভূতি ভাষায় যথার্থ গ্রহণ বা ঠিক প্রকাশ কখনো সম্ভব হয় না।

আমরা অনুভব করি এবং তা প্রকাশ করি। এর জন্যে উপযোগী শব্দ নির্বাচন করা হয়। উপযোগী অর্থে সেইসব শব্দ বা অনুভূতির বিকল্প হিসাবে কাজ করবে। আমরা সেইসব শব্দে বস্তুর স্থিতি লাভ করি। শব্দ দুরকম। মৌলিক ও যৌগিক। যৌগিক শব্দ সেইসব যা আমরা আদান প্রদানে ব্যবহার করে থাকি। আমাদের অনুভব নিকষ একটি চেহারায় হয় না, আর একটা যৌগিক রূপ আমাদের মধ্যে আসে। তেমনি মৌলিক শব্দ ব্যবহারে কিছুই প্রকাশ হয় না। প্রয়োজন অনুযায়ী তা যৌগিক হয় এবং উপযোগী হয়ে ব্যবহৃত হয়। যেমন জল একটি যৌগিক শব্দ। জল অর্থে একটি সরল অনুভূতি বোঝায় না। আমরা পুকুরের জল, সমুদ্রের জল, কলের জল দেখেছি। এবং এছাড়া আরো নানা ধরনের জল। এবং এই সমস্তের অন্তর্নিহিত কতগুলি বিশেষ ধর্ম যা আমরা 'জল' বলামাত্র স্মরণ করি। এবং 'জল' শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এতগুলি বোধ, চিন্তার একটা সমাহার আমাদের মধ্যে পশ্চাৎপট রূপে কাজ করে। কিন্তু মৌলিক শব্দের ধরন একেবারে আলাদা। যেমন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় ভেতরে একটা স্বগত শব্দ আমরা

চেষ্টা করলে শুনতে পাই। এটি মৌলিক শব্দ বা নেহাতই দৈহিক এবং অনুভূতির সাথে একাত্ম।

এমন নাকি ঘটে যে আমাদের শরীরে নিয়ত এক নাদ ধ্বনিত হচ্ছে। প্রাণবায়ুর সঙ্গে জঠরাগ্নির সংঘর্ষে সেই নাদের উৎপত্তি এবং তা দৈহিক। হয়তো আমাদের অস্তিত্বের যে অন্নময় এবং প্রাণময় অংশ, এই মৌলিক শব্দে তার প্রকাশ। কোন বিশেষ অনুভূতি প্রকাশের যদি চেষ্টা না করি তখন একাগ্র হয়ে জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ার সময় ভেতরে 'অ' ক্রমাগত এই শব্দ হচ্ছে এটা বুঝতে পারি। লক্ষণীয় এই, বাংলার 'অ' আদিমতম অক্ষর এবং অন্যান্য সমস্ত অক্ষর ব্যবহারের সময় এই 'অ' ব্যবহার করতে হয়। ভাষাতত্ত্ববিদেরা নানা বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনায় স্থির করেছেন কিভাবে এই মৌলিক শব্দগুলি যৌগিক শব্দে এবং যৌগিক শব্দগুলি ভাষায় পরিণত হয়। তবে মোটামুটিভাবে আমরা এইটুকু বুঝি, মৌলিক শব্দগুলির অনুভূতি এবং ব্যবহার পারস্পরিক ভাবে যৌগিক শব্দে পরিণত হয় এবং এই যৌগিক শব্দগুলির মিছিল একটি ভাষার রূপ নেয়।

বস্তুত আমাদের সমস্ত ক্রিয়াকর্ম, সমস্ত অনুভূতি এই শব্দকে বহন করে চলে। এটা শুধু মানুষ নয়, সমস্ত জীবজন্তু তাদের প্রকাশে তো বটেই, অনুভবের সময়ও একটা শব্দ করতে থাকে। এমন কি চলমান যাবতীয় তাদের সঙ্গে শব্দ বহন করে। যা স্থানু তার হয়তো স্থির অবস্থায় কোন প্রকাশিত শব্দ নেই কিন্তু নাড়াচাড়া করলে তার নিজস্ব শব্দ প্রকাশিত হয়। ভারতীয় দর্শনে শব্দকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। যদি এমন হয় সমস্ত স্থানু, চলমান, প্রাণী, অনুভব, প্রকাশ এ সমস্ত তাদের বিকল্প কোন না কোন শব্দ বহন করছে তবে শব্দসমূহই এই যাবতীয় কিছুর সামগ্রিক বিকল্প একটা চেহারা ধারণ করতে পারে। একজন অন্ধের কাছে যে জগৎ প্রকাশিত। অর্থাৎ স্থূলভাবে শব্দ প্রকাশের প্রায় একমাত্র মাধ্যম।

ভাষা তথা শব্দ দিয়ে মানুষে মানুষে সেতুবন্ধ হয়। আসলে যোগাযোগ ব্যবস্থা যা কিছু হোক এবং যে করে হোক, সবাইকে একত্র করে। আগে অনেক পৃথিবী ছিল, কিন্তু সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে পৃথিবী এক হয়েছে এবং এমন

দিন আসছে যখন মহাপৃথিবী এক হতে চলেছে। উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা সেই একীকরণের মূলসূত্র হিসেবে কাজ করছে এবং করতে থাকবে।

আগে অনেক পৃথিবী থাকলেও আজ এক পৃথিবী। আর পূর্বইতিহাস অনুধাবন করে এটা বোঝা গেছে, আদিম অনুভূতিসকল পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তের মানুষের একইরকম ছিল। আদিমমানুষ একক অবস্থায় অথবা আর একজনকে দেখে বা দলের সান্নিধ্যে এসে তাদের সেই অনুভূতি প্রকাশ করতো। যেহেতু আদিম প্রকাশ নেহাতই দৈহিক ছিল অতএব তখন ভাষা সর্বত্র এক ছিল এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। একই ভাষা অর্থে শব্দ-স্ফোটবিহীন কিছু ধ্বনিময় উচ্চারণ যা অনুভূতির সরাসরি প্রকাশ এবং যা অসংগত ও অবিন্যস্ত। তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় বিচ্ছিন্ন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে থেকেও পৃথিবীর আদিমমানুষদের একটি ভাষা ছিল দৈহিক অনুভূতিময়। শব্দেরা ছিল দুর্বোধ্য এবং শরীরের বিশেষ ভঙ্গীগুলি ভাষার মধ্যে একটা অঙ্গ হিসেবে প্রকাশ পেতো।

ক্রমে মানুষ একসঙ্গে বসবাস করতে লাগলো। সহনশীল হলো, মানসিকতা প্রভাব বিস্তার করতে লাগলো দৈহিক অনুভূতির ওপর, আদান-প্রদানের প্রয়োজন দেখা দিলো। প্রকাশের শব্দগুলো পারস্পরিক বোঝা-পড়ায় চিহ্নিত করা হলো, যার ফলে বিষয়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপন অর্থপূর্ণ হয়ে উঠলো। এই শব্দসকলের সম্মিলনে একটা সুনিয়ন্ত্রিত ভাষা চেহারা নিল যা সেই জাতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে রইলো। এই ভাবে একটি জাতি এবং তার পরিপূরক ভাষা গড়ে উঠলো।

ধরা যাক একটি জাতি সেই অর্থহীন দুর্বোধ্য শব্দসম্বলিত ভাষাকে ক্রমে পরিবেশের উপযোগী করে অর্থপূর্ণ এবং চিহ্নিতভাবে নিজেদের মধ্যে ব্যবহার করতে সুরু করল। ক্রমশ তা আরো বেশি করে ব্যবহার করতে করতে। অনেক শব্দের অভাব অতএব অনুভূতি অনুযায়ী এবং প্রকাশের উপযোগী নতুন শব্দ আমদানী করে অথবা সৃষ্টি করে। যদি চলতি ভাষার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে তো জায়গা করে, নয়তো এক সময় অবহেলায় অস্পষ্ট হয়ে ক্রমে নতুন নতুন শব্দ নতুন নতুন বিষয় আহ্বান করে এবং সেই সব

নতুন বিষয় আরো নতুন শব্দ আকর্ষণ করে। এই ভাবে সময়ের সাথে সাথে পরিবেশের সাথে সাথে প্রয়োজনের সাথে সাথে ভাষা বিবর্তিত হতে হতে নতুন নতুন শব্দ, শব্দ বিবর্তিত হতে হতে ভাষার নতুন চেহারা। ক্রমে শব্দ সমৃদ্ধ হতে থাকে এবং ভাষা উন্নত হতে থাকে।

ভাষা যত সমৃদ্ধ হয় একটি জাতি তত স্বচ্ছন্দ বোধ করে। তার জ্ঞানের পরিধি বাড়তে থাকে। জাতিতে জাতিতে ভাষার বৈচিত্র্যে মানুষকে তার ভালমন্দ নিয়ে ভাবতে হয়েছে। ফলে জাতির নিজস্ব বৈচিত্র্য, তার সংস্কৃতি রক্ষা এবং উন্নত করার জন্যে যেমন নিজস্ব ভাষাকে নিজের গণ্ডীর মধ্যে আরো শক্তিশালী করার প্রয়োজন হয়েছে তেমনি বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে যাতে সমস্ত পৃথিবীর লোক একত্র ভাবতে পারে সেইজন্যে কিছু কিছু সর্বজনীন ভাষারূপ প্রবর্তন করা হয়েছে। যেমন অংক, যন্ত্রবিদের নকশা ইত্যাদি। অধিক উন্নতির জন্যে যেমন নিজস্ব ভাষার উন্নতি প্রয়োজন তেমনি সর্বজনীন ভাষার সমৃদ্ধি অনিবার্য।

জাতিগত ভাষা গণ্ডী টানে জাতিকে ঘিরে। নিজেকে ঘিরেও তার একটি গণ্ডী আছে। অজস্র শব্দ তাদের ঐতিহ্য নিয়ে, আরো সম্ভাবনা নিয়ে সেখানে। তাদের শৃঙ্খলায় রাখার জন্যে ক্রমশ ব্যাকরণ গড়ে ওঠে। শব্দ-গুলির অযথা বা যথেচ্ছ প্রকাশ বন্ধ করার জন্যে বিশেষ উচ্চারণরীতি প্রবর্তিত হয়। শব্দগুলির যেহেতু নিজের গতি নেই, তাই তার অন্তঃস্থ বিষয়কে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় তথা একজন আরেকজনকে পৌঁছে দেবার জন্যে এই উচ্চারণের প্রয়োজন হয়। একে শব্দবাহক বলা যেতে পারে। এই উচ্চারণকে বহন করা ছাড়া উচ্চারণের আরো কিছু কিছু ভূমিকা থাকে। শব্দের নিজস্ব প্রকাশ আছে এবং তার অনেকটা সুপ্ত থাকে। উচ্চারণ এই সুপ্তিকে জাগিয়ে তোলে। গ্রাহক যথার্থ উচ্চারণের মাধ্যমে শব্দের পূর্ণ প্রকাশ গ্রহণ করতে পারেন। এছাড়া উচ্চারণ কখনো কখনো আরো কিছুটা এগিয়ে তার ভূমিকা রাখে। এই উচ্চারণকে এমনভাবে শব্দের সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব যে, শব্দকে বহন করে তার পুরো প্রকাশ সে তো করবেই, আরো এগিয়ে সেই শব্দের ভেতরে প্রবেশ করে গ্রাহকের ভেতরে সুপ্ত অনুভূতিসকলকে, স্মৃতিসমূহকে উত্তেজিত

করণে। লক্ষ্য করার বিষয়, তখন শব্দ এই উচ্চারণের বাহক হয়ে কাজ করে। যেমন কোন কবিতার আবৃত্তি বা বক্তৃতা শোনার সময় গ্রাহকদের বিশেষ অনুভূতিশীল হতে দ্যাখা যায়। এই ভাবে একটি ভাষা তার গণ্ডীর ভেতর শব্দ, তার ব্যাকরণ এবং তাদের উচ্চারণকে নিয়ে গড়ে ওঠে।

উচ্চারণ অবশ্য সেই জাতির, দেশের প্রাকৃতিক আবহাওয়া জলবায়ু রীতি-নীতি এসবের ওপর নির্ভর করে। কারণ প্রাকৃতিক বিভিন্নতা কিছু কিছু মানসিক তফাৎ তৈরী করে এবং স্বভাবত তা প্রকাশে প্রতিফলিত হয়। পাহাড়ী লোকেদের সঙ্গে নদী এবং সমুদ্রের পাড়ের লোকেদের মানসিক গড়ন এবং প্রকাশভঙ্গীতে একটা তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। তেমনি শৃঙ্খলাপরায়ণ এবং বিশৃঙ্খল জাতির উচ্চারণরীতিও ভিন্ন হয়। এটা লক্ষ্য করে থাকি, বিভিন্ন জাতি একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ করে থাকে।

শব্দের উচ্চারণ আছে তাকে বহন করার জন্যে। কিন্তু শব্দের অস্তিত্ব এখানে তাৎক্ষণিক। প্রকাশিত হয়ে গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দিয়ে তার কাজ শেষ। তেমনি তাকে ধারণ করার প্রয়োজন আছে। আমাদের অনেক বিষয় আমরা সঞ্চিত রাখতে চাই তার বিশেষের জন্যে। প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব একটা দৃশ্য চেহারা আছে। ভাষার মৌলিক উপাদান অক্ষর। প্রতিটি অক্ষরের একটি করে প্রতিরূপ চেহারা অর্থাৎ লিপি আছে। অক্ষরগুলোর নিজস্ব কোন অর্থ হয়তো গ্রাহকের কাছে থাকে না কিন্তু অক্ষরসমষ্টি এবং তার ধ্বনি কিছু একটা অর্থ সৃষ্টি করে, না ঐ লিপি-গুলির সমষ্টি? কোন শব্দের লিপি সমষ্টির মধ্যে আমরা সেই শব্দের বিষয়কে গচ্ছিত রাখতে পারি। যেমন কোন প্রবন্ধ বা নিবন্ধ অর্থে লিপিসমষ্টির প্রবাহ যেখানে আমাদের অনুভূতি সকল শব্দসমূহে তথা তাদের স্মারক লিপি সমষ্টিতে গচ্ছিত রাখা আছে যা অনেক অনেক পরেও আমরা উদ্ধার করে অনেকটা সেই অনুভবে নিজেকে ফিরিয়ে নিতে পারি। অতএব ভাষার গণ্ডীর ভেতর থাকে অক্ষর, শব্দ, তাদের ব্যাকরণ, উচ্চারণ এবং লিপি এবং এই সামগ্রিক চেহারা নিয়ে একটি ভাষা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

এই লিপির সাথে উচ্চারণের একটা সম্পর্ক থাকে। হ্রস্ব বা দীর্ঘ

উচ্চারণ লিপি গ্রহণ করে। উচ্চারণের ভাঙচুরও লিপি অনুগামী হয়ে সেই মত গ্রহণ করে। ভাষা প্রয়োজন অনুযায়ী যেমন বিবর্তিত হয়, উচ্চারণ তার ধারা বহন করে এবং লিপিতেও তার সেইমত প্রতিফলন হয়।

জাতিগত ভাষা যেমন সেই ভাষাভাষীদের একত্র করে তেমনি আন্তর্জাতিক ভাষাগুলি অংক বা যন্ত্রবিদের নকশা ইত্যাদিও পৃথিবীর বিশেষজ্ঞদের একত্র করে। অংকের মুখোমুখি বৈজ্ঞানিকেরা এবং নকশা পরীক্ষায় ব্যস্ত যন্ত্রবিদেরা নিশ্চয়ই তখন নিজেদের বিভিন্ন জাতির লোক বলে মনে না করে এই পৃথিবীর লোক বলে মনে করেন।

আসলে শব্দের তো মাত্র বিনিময়মূল্য, যেমন অর্থের। আমি বাসে উঠে যে ভাড়া দিলাম তা আর কিছুই না, যে শ্রম দিয়ে আমি ভাড়ার পয়সাটা অর্জন করেছি তাই দিলাম এবং তার বিনিময়ে আরো অনেকে মিলে তাদের শ্রম দিয়ে আমার কিঞ্চিৎ স্বাচ্ছন্দ এনে দিলো। তেমনি এই ভাবনা চিন্তা অনুভূতিসকল একজন থেকে আরেকজনে সঞ্চারিত হবার বিনিময় মাধ্যম হয়ে শব্দেরা তাদের ভূমিকা রাখে। শব্দচর্চা এই মাধ্যমকে আরো যথার্থ এবং নিখুঁত করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অক্ষর সম্বলিত যেমন অর্থপূর্ণ শব্দ থাকে তেমনি অর্থবিহীন ধ্বনিসম্বলিত অনেক শব্দ আছে। এই সমস্ত শব্দ সম্মিলিত হয়ে সমস্ত পৃথিবীকে প্রকাশ করে। যেন এই পৃথিবীটা শব্দের মধ্যে জেগে থাকে। যখন এই শব্দের বড় অভাব, যেমন কোন গভীর রাত্রে, পৃথিবী সুপ্ত হয়ে থাকে। আর সব তেমনি থাকে তবু গভীর এক শূন্য যেন বিরাজ করে।

যদিও শব্দ এবং তার অনুষঙ্গ দিয়ে ভাষার অস্তিত্ব তবু এছাড়া আরো কিছু আছে। ভাষা অর্থে সেই জাতি, সেই জাতির সংস্কৃতি, তার লোকজন। সমগ্র জাতিটা সেই ভাষার মধ্যে একটা সূক্ষ্মরূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। একটি দুর্বল ভাষা সেই জাতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা ভাল করে না। তেমনি একটি উন্নত ভাষা সেই জাতি সম্পর্কে আমাদের আপনা থেকে শ্রদ্ধাশীল করে। কারণ সেই ভাষার মধ্যে সেই জাতির চিন্তা ভাবনাসকল বিধৃত থাকে।

একজন বিদেশীর সাথে আমরা যে দূরত্ব অনুভব করি তার কারণ ভাষার মাধ্যমে যে সংস্কৃতির বা রীতিনীতির অংশ পরিস্ফুট তার পটভূমি এক থাকে না। যেন ভাষায় সমগোত্র না হলে আমাদের কোথায় একটা ছিন্নযোগ হয়ে যায়। কিন্তু এক ভাষাভাষী হলে সে সমস্যা আর থাকে না। আমরা এক সমতলে চলে আসি। সেই সমতল হচ্ছে ভাষা। যে ভাষাকে সেই জাতি তিল তিল করে গড়ে তুলেছে। এবং একই সাথে যে ভাষা সেই জাতিকে তার অধিকারকে ধারণ করে বয়ে নিয়ে চলেছে।

২

আমাদের প্রতিদিনের চলায় যে জীবন গড়ে ওঠে সেখানে প্রাত্যহিক ধারণা, তার থেকে পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান এবং এইভাবে নিজের সম্পর্কে বোধ নিয়ে আমরা বেড়ে উঠি। পৃথিবী সম্পর্কে আমরা সচেতন হই। আমাদের সংযোগ স্থাপিত হয়। পৃথিবী সম্পর্কে জ্ঞান এবং আমি এই দাবী নিয়ে প্রতিটি লোক তার জগৎ সামনে রাখে।

এই ত্রয়ী বস্তুত উপলব্ধির সূত্র। আমি প্রতিদিনের উপলব্ধির মধ্য দিয়ে দিনে দিন গঠিত হই। এই উপলব্ধি সকল আমার নিভৃতে যে অস্তিত্ব ভার মূল উপাদানে সঞ্চিত হচ্ছে সেই অস্তিত্ব আরো উপলব্ধি করে এবং আরো গঠিত হয়। আমাদের যেমন গড়ে ওঠা, বেড়ে ওঠা, উপলব্ধি সেখানে অনিবার্য। এই উপলব্ধির দ্বারা বাইরের পৃথিবী আমাদের ভেতর আর এক পৃথিবী তৈরী করে।

এই ভাবে আমাদের যে অস্তিত্ব তার প্রকাশ সমান গুরুত্বে অনিবার্য। অস্তিত্বের নিজস্ব একটি প্রকাশরূপ থাকে এবং আমাদের সমস্ত উপলব্ধি অঙ্কিত হলেও তার মধ্যে কিছু কিছু প্রকাশ হবার আকাঙ্খা রাখে। কখনো আমাদের ধারণ শক্তি অতিক্রম করেও অনেক উপলব্ধি সরাসরি প্রকাশিত হয়ে যায়। এই আদান-প্রদানের মধ্যে আমরা আমাদের অস্তিত্বের ভারসাম্য বজায় রাখি।

আমরা উপলব্ধি করি তথা আমাদের অনুভূতি হয়। এর মধ্যে কিছু কিছু বিশেষ অনুভূতি যা বিস্মিত করে। আমরা প্রকাশ করি নিয়ত। কিন্তু তার মধ্যে কিছু কিছু প্রণোদিত প্রকাশ। যা হয়তো সেই বিশেষ অনুভূতি নির্দেশিত। তথা অনুভূতিকে অনুভব করা এবং প্রকাশের মাধ্যমে গ্রাহককে সেই অনুভব করানো। যেদিন থেকে এই আবেগ মানুষকে প্রেরণা দিয়েছে সে দিন থেকে শিল্প সম্পর্কে চেতনায় সে উদ্বুদ্ধ। শিল্পকর্ম তাকে প্ররোচিত করতে সুরু করেছে।

অনুভূতি সঞ্চিত হতে হতে অস্তিত্ব গড়ে উঠল। এর মধ্যে আমি ক্রমে আরো এবং আরো উদ্ভূত হয়ে যাবো। এবং এক সময় পাকাপোক্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক একটি জগৎ গড়ে ওঠে। যেখানে আমি ঈশ্বর। যেমন একটি গ্রামের অধিপতি হয়ে কেউ মহারাজাধিরাজ হয়ে বসে। এই ঈশ্বর আমি অতঃপর যে সব অনুভূতি আসে তাকে নিজস্বে পরিণত করে। নিজের প্রয়োজন মত খুশীমত তাদের গড়ে। যেমন সূর্য থেকে আলো নিয়ে আতসকাচের ভেতর দিয়ে বিশ্লেষে বহুরঞ্জনা।

আমি ঈশ্বর হয়ে যে জগৎটাকে আমার ইন্দ্রিয় সকলের মাধ্যমে পরিচালনা করছি, স্বভাবত সেখানে কর্তৃত্বের বাসনা প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। আমার ইচ্ছেশক্তি লব্ধ অনুভূতিকে নতুন করে সৃষ্টি করতে চায়। প্রথম প্রথম হয়তো যেভাবে গ্রহণ তার অনুকরণে সৃষ্টিপর্ব চলে কিন্তু ক্রমশ আমি ঈশ্বর হয়ে উঠলে আধিপত্য নিয়ে নিজের মত সমস্ত কিছু গড়ে তোলবার ইচ্ছে হয়। নিজের মত একান্তে কিছু গড়ে তোলা মানুষকে সৃষ্টিকর্মে নিয়োজিত করেছে। পরিবেশ থেকে অনুভূতি গ্রহণ, নিজের ভেতর তা জারিত করে, অনুভূতির নবরূপায়ণ। এই পর্যায়গুলি অবশেষে আমাদের সৃষ্টিকর্মে উদ্বুদ্ধ করে।

এই অনুভূতির নবরূপায়ণ, এটার যথার্থ প্রকাশ হোক। সৃষ্টিকর্মের এটা অবশ্যেষ ইচ্ছে। এই যথার্থ প্রকাশের উপযোগী শিল্প চাই। ঈশ্বর আমিকে তখন শিল্পী হতে হয়। কারণ অনুভূতি আমরা সরাসরি পৌঁছে দিতে পারি না। সৃষ্টিকর্ম যতক্ষণ আত্মগতে হয়তো তখন প্রয়োজন নেই। কিন্তু আর কাউকে তা পৌঁছে দিতে হলে শিল্পীকরণ দরকার এবং

শিল্পমাধ্যম সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হওয়া ঈশ্বরআমির পক্ষে অনিবার্য।

আমি সৃষ্টি করতে চাই। এর জন্যে আমার ভেতরে উন্মুখ অনুভূতি সকল প্রকাশের উপযুক্ত শিল্পমাধ্যম খোঁজে। স্রষ্টাকে শিল্পী হতে হয়। স্রষ্টা তার অনুভূতির গ্রহণ বৈশিষ্ট্যে এই শিল্পমাধ্যম নির্বাচন করে নেন।

পারস্পরিক যোগাযোগের জন্যে আমাদের পরিচিত অনেক মাধ্যম আছে। এই যোগাযোগ মাধ্যমগুলি যথোপযুক্ত চর্চা করে শক্তিশালী এবং সৃষ্টির গূঢ় অলৌকিক এবং একান্ত বিষয়সকল প্রকাশের উপযোগী হলে শিল্পমাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। আমরা বলি, বলার সময় শব্দ ব্যবহার করি। কিন্তু সেখানে কত অপচয় কত অনর্থক ব্যবহার। কিন্তু ঠিক ঠিক চর্চায় শব্দের শক্তি আবিষ্কার করে ঠিক ঠিক ব্যবহারে তা সাহিত্য। পথে ঘাটে কত রঙ অবহেলায় পড়ে থাকে কিন্তু কোন কোন রঙ এমনভাবে শিল্পী ব্যবহার করেন আমাদের অভিভূত করে, ভেতরে আবেগের সঞ্চার হয়। কত ধ্বনি উচ্চারিত হয়, আমরা তাতে প্রায়াশ বিরক্ত। কিন্তু ঠিক ঠিক মাত্রায় তার ব্যবহারে আমরা বিহ্বল হই, সঙ্গীত তা অনেক সময় প্রমাণ করে। আমাদের শরীর, পরিবেশ এরা তো নিয়ত গতিশীল কিন্তু তা আমাদের অনুভূতিতে কি অদ্ভুত গাঢ় ছাপ রাখে কোন অভিনয় বা চলচ্চিত্র দ্যাখার সময় আমরা বুঝতে পারি। এমন কি জাতির তথা মানুষের মঙ্গলচিন্তাকে যথার্থ রূপ দিতে গিয়ে যে পরিকল্পনা বিনিয়োগ এবং রূপায়ণ—এই সমন্বিত ব্যাপারটি সাজানো হয়, তাকেও আমরা শিল্প বলে থাকি।

সাহিত্য এইরকম শিল্পগুলির অন্যতম। এবং শব্দ তার মাধ্যম তথা উপাদান।

যেমন অন্যান্য শিল্পে, সাহিত্যেও সমস্ত ব্যাপারটা তিনটে পর্যায়ে কাজ করে। লেখকের নিজস্ব অংশ, এর পরের অংশে তা স্থাপন এবং তৃতীয় অংশ গ্রাহকের। দ্বিতীয় অংশে শব্দের সম্পূর্ণ ভূমিকা। এখানে লেখক সৃষ্টি করছেন এবং এখান থেকে পাঠক তা গ্রহণ করছেন। যদিও লেখকের এ ভিন্ন সরাসরি সংযোগের কোন উপায় নেই।

শব্দ দিয়ে সৃষ্টি করতে হয়। তাই একজন লেখক শব্দের জন্যে অনেক পরিশ্রম করেন। অভিজ্ঞতায়, চর্চায় শব্দের শক্তি তাঁকে আয়ত্ত করতে হয়। শব্দের উপর কর্তৃত্ব অর্জন করতে হয়। যে তীব্রতার সঙ্গে লেখকের মধ্যে অনুভূতি উন্মুক্ত হয়, শব্দ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা না থাকলে তাতে সেই অনুভূতি স্থাপন করা বেশ দুঃসাধ্য। সেই ব্যর্থতার যন্ত্রণা লেখককে পীড়িত করে। প্রথম প্রথম শব্দ এইরকম প্রতিকূল থাকে। কিন্তু ক্রমশ ব্যবহারে ঠিক ঠিক শব্দ খুঁজে পাওয়া, তাকে ঠিকমত স্থাপন করা, এর পর সেই শব্দ চালিত করা—এই ভাবে ক্রমে একজন লেখক তাঁর অনুভূতি এবং শব্দে সাযুজ্য লাভ করতে অভিজ্ঞ হন। এই শব্দ এমনভাবে ব্যবহার করতে হয় যাতে লেখকের অনুভূতি গূঢ় অলৌকিক বিষয়সকল বহন করবার যোগ্যতা অর্জন করে। কিন্তু শব্দ সম্পর্কে শুধু লেখক নন, পাঠককেও অভিজ্ঞ হতে হয়। যদি লেখক ব্যবহার করে সেই শব্দে গতি আবেগ এমনভাবে আরোপ করতে পারেন যাতে পাঠক পড়ামাত্র তাঁকে গিয়ে আঘাত করতে পারে তবে সেই শব্দের আঘাতে লেখকের সেই গূঢ় বিষয়সকল গ্রহণ করতে সমর্থ হবেন। এর জন্যে পাঠকের শব্দচর্চা এবং অভিজ্ঞতার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

সাহিত্যে যে শব্দের ব্যবহার হয়, ভাষা ক্রমে তার জন্ম দিয়েছে। উচ্চারণ সম্বলিত সেই শব্দসকল একভাষাভাষী লোকেরা তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ, নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ায় একটা সমঝোতা এবং সেই অনুযায়ী শব্দগঠন এর মাধ্যমে গড়ে তোলে। কথাবার্তায় শব্দসকল অনর্থক অপচয় হয়তো হয় কিন্তু সাহিত্যে তার পরিমিত এবং যথার্থ ব্যবহার ক্রমশ শব্দের বিবর্তনের পথে এগিয়ে যায়। অবশ্য কথাবার্তায় যথেচ্ছ শব্দগুলিও সাহিত্যকে আরো বাস্তবসম্মত হতে নির্দেশ করে প্রায়শ। তবু যেহেতু একটা বিশেষ গূঢ় বিষয় বহন করবার জন্যে নির্দিষ্ট, সাহিত্যের শব্দগুলিকে তাই অনেক সংযমী হতে হয়।

সাহিত্যে নতুন শব্দ-সৃষ্টি করবার প্রয়োজন দ্যাখা দেয় অনেক সময়। কিন্তু তা যেমন তেমন হলে চলবে না। তাকেও সৃষ্টি হতে হবে একটা ধারা

অনুযায়ী। বর্তমান শব্দগুলি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়। একটা সঙ্গতি রেখে। একটা নতুন শব্দ, অথচ পাঠক তৎক্ষণাৎ তা গ্রহণ করতে দ্বিধা করবে না। কখনো কখনো কিছু দেরী হতে পারে এই মাত্র। এই নতুন শব্দের প্রয়োজন হয় বিষয়কে প্রকাশ করবার উপযুক্ত শব্দের অভাব ঘটলে। অনেক শব্দ এমন দ্যাখা গেছে, পাঠক একেবারে গ্রহণ করেন না। ভাষার গণ্ডীতে হয়তো সংযোজিত বিন্দু অবহেলায় পড়ে আছে। তেমনি পাশাপাশি অনেক শব্দ বহুলব্যবহারে কৌলিন্য পেয়ে গেছে, এমন কি কাকের মুখে মুখে তা ঘোরাফেরা করে।

নতুন শব্দ যে শুধু সাহিত্যে সৃষ্টি হয় তা নয়। লোকেরা বলাবলি করে বিশেষ বিশেষ শব্দ কিছু কিছু সৃষ্টি করে এবং তা সাহিত্যে স্থান পেয়ে যায়, এমন ঘটনা অনেক। বিদেশী শব্দের আমদানী সাহিত্যকে কম সমৃদ্ধ করে না, যদিও তা নতুন ভাষার গণ্ডীতে পড়ে মানানসই হওয়া চাই। পাঠকরা এক্ষেত্রে তা গ্রহণ করে নিতেও দ্বিধা করেন না।

অভিজ্ঞতায় এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ায় শব্দ সৃষ্টি হয় এবং কথার আদান-প্রদানেও সাহিত্যে তা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ব্যাপারটা হয়তো এমন সরল নয়। আমাদের মনে হতে পারে কথাবার্তার সময় ব্যবহৃত শব্দগুলি ভাব আদানপ্রদানের জন্যে যথেষ্ট কিন্তু আসলে ঠিক তা না। কথা বলার সময় আমাদের মুখচোখের ভঙ্গী এবং অনেক সময় কান্না এবং কখনো হাত পা নাড়া—এই সমস্ত ব্যবহার করে আমরা শব্দের প্রকাশশক্তির যেটুকু ঘাটতি আছে তা পূরণ করে নি। তাই এক্ষেত্রে শব্দ সম্পর্কে খুব বেশী সচেতন না হলেও অসুবিধে হয় না। কিন্তু সাহিত্যে এসবের সুযোগ নেই। সেখানে মাত্র শব্দগুলি লিপিতে গচ্ছিত থাকে। লিপির সাথে শব্দের সম্পর্ক এবং সেই শব্দ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ইত্যাদি মাত্র আছে এবং তা দিয়ে লেখকের বিষয় পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত হবে। অতএব শব্দের প্রকাশশক্তির সামান্য অভাব ঘটলে পাঠক বিপথগামী হবেন। এবং পাঠকের শব্দ সম্পর্কে সম্যক্ বোধ না থাকলে লেখকের বিষয় গ্রহণ করতে পারবেন না। অতএব এটা

একটা বৌধ ব্যাপার। শব্দের মধ্যে নিহিত তার নিজস্ব শক্তি, গতি, বিষয় বহনের যোগ্যতা এগুলি লেখককে ঠিক ঠিক বুঝে নিতে হবে যথেষ্ট চর্চা এবং অভ্যাসের মধ্য দিয়ে এবং পাঠককেও সে বিষয়ে উপযুক্ত সচেতন হতে হবে। বিশেষ করে একজন লেখক তাঁর গোপন বিষয় শব্দে স্থাপন করতে গেলে শব্দ সম্পর্কে নিখুঁত জ্ঞান তাকে অর্জন করতে হবে। এবং শব্দের নিজের ক্ষমতার একটা সীমা আছে। বস্তুত এটা বোধ হয় কখনো সম্ভব নয় যে লেখকের চেতনায় যে বিষয়ের আঘাত হলো শব্দ ঠিকঠিকভাবে তা পাঠকের কাছে বহন করে যাবে।

অতএব সাহিত্যে যথার্থ শব্দ ব্যবহার করতে পারা অনেক অভ্যাস দাবী করে। এমন ঘটে যে লেখক উৎসাহভরে তার ভেতরের উন্মুখ বিষয় প্রকাশ করতে গেলেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতা অনুযায়ী শব্দ ব্যবহার করলেন অথচ সেই শব্দসকল ঠিক প্রতিফলন ফিরিয়ে দিতে পারল না। লেখক নিরাশ হন। তাঁকে নতুন শব্দের সন্ধানে বেরোতে হয়। সন্ধান করতে না পারলে অনেক সময় নতুন শব্দ সৃষ্টি করে নেন। প্রত্যেক লেখক শিল্পীর এমন অভিজ্ঞতা যে তাঁর অনেক প্রিয় বিষয় শব্দে ঠিকমত স্থাপন করতে না পারায় ব্যর্থ হয়ে গেছে। এবং তেমন গুরুত্বপূর্ণ না এমন বিষয় প্রয়োগনৈপুণ্যে অসাধারণ হয়ে গেছে।

শব্দ ব্যবহারের যে অভ্যাস তা প্রাথমিকভাবে শব্দকে অনুসরণ করা এবং তার প্রকৃতি বুঝে নেয়া। যেমন শব্দের একটা প্রকাশশক্তি আছে। শব্দের মধ্যে বহনক্ষমতার তারতম্য আছে, সব শব্দের গতি এক নয়। 'দ্রুতগতি' বা 'তীব্রগতি' শব্দ দুটো ধরা যাক। আপাতচোখে দুটোর হয়তো এক অর্থ। কিন্তু 'দ্রুতগতি' শব্দটা আপনার মধ্যে যে ছবি আনবে তা কোন একটা কিছু খুব তাড়াতাড়ি চোখের সামনে থেকে দূরে যেতে যেতে ছোট আরো ছোট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু 'তীব্রগতি' শব্দ আপনার মধ্যে, গতিজনিত বিস্ময় সঞ্চার করবে। গ্রাহকের কাছে এই দুটো শব্দ বস্তুত ভিন্ন বোধ নিয়ে আসে। 'গভীর প্রেম' এই শব্দ প্রেমের যে আত্মস্থ দিক বহন করে; 'নিবিড় প্রেম' ঠিক তা করে না, এই শব্দে অন্তরঙ্গতার কথা মনে হয়। 'গাঢ় অন্ধকার'

যেমন জমে থাকে, 'অন্ধকার অন্ধকরা' অমনি গতি পেয়ে যায়, যতদূর খুশী অন্ধকার ছড়িয়ে যেতে পারে। মশালের আলো জ্বললে এবং বৈদ্যুতিক আলো জ্বললে আমাদের মধ্যে অনুভূতির যে বেশ তারতম্য ঘটে যায় তা খুব বেশী বুঝিয়ে বলার দরকার নেই।

প্রথমত অনেক লেখা-পাঠের মধ্য দিয়ে শব্দ ব্যবহার লক্ষ্য করা, শব্দের গতি প্রকৃতি অনুধাবন করা, এইভাবে অভ্যেসের মাধ্যমে শব্দ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করা, তারপর নিজের বিষয় প্রয়োগের সময় সেই অভিজ্ঞতা অনুযায়ী শব্দ ব্যবহার, ব্যর্থতায় নতুন অভিজ্ঞতা এবং নতুনভাবে শব্দের ব্যবহার——এইভাবে লেখককে সাহিত্যে যথার্থ শব্দ ব্যবহারের অভ্যেস করতে হয়।

এছাড়া শব্দসমষ্টির জন্যে আর একটি সূত্র প্রয়োজন। প্রতিটি শব্দ একক-ভাবে হয়তো প্রকাশের জন্যে উপযোগী হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেই শব্দসমষ্টি পাশাপাশি এসে কি একটা অভাবে ছাড়াছাড়ি থাকে। প্রতিটি শব্দ নিজের ভেতর একটা বিশেষ মাত্রায় গূঢ় ছন্দ বহন করে। তার পাশাপাশি অবস্থিত অন্য শব্দ বিষম হলে এক সাথে চলার ব্যাপারে গোলমাল দ্যাখা দেয়। ছন্দের এই সূত্রটি পাশাপাশি শব্দগুলির মধ্য দিয়ে সুষমভাবে বিষয়কে বহন করে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

কবিতায় এই ছন্দ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। ছান্দসিকেরা তা নিয়ে তর্ক করেছেন, সিদ্ধান্ত করেছেন। ভবিষ্যতে আরো করবেন। কিন্তু গদ্যে যে সূক্ষ্ম প্রবহমান ছন্দ আছে তা নিয়ে হয়তো অনেক লেখক এবং পাঠক বিচ্ছিন্নভাবে সচেতন কিন্তু তার সঠিক রূপ এবং প্রকৃতি নিয়ে কোন আলোচনা সম্ভবত হয় নি। তা আজো পর্যন্ত লেখক এবং পাঠকের মধ্যে পারস্পরিক এক সূক্ষ্ম বোঝা পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। একটি গদ্য পড়তে ভাল লাগার কারণ শব্দের ব্যবহার সুষম মাত্রায় হয়েছে। কিন্তু ছাড়াছাড়া লাগে বা তেমন মনোযোগ রাখা যাচ্ছে না বা লেখাটা তেমন জমছে না, এর কারণ শব্দ ব্যবহারে কোথাও বিষম কিছু ঘটেছে। অনেক লেখক এই ছন্দসূত্র আয়ত্ত করার ফলে দ্যাখা গেছে তাঁর দুর্বল বিষয় দুর্বল শব্দব্যবহার সত্ত্বেও পাঠকদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছেন।

সাহিত্যে বিষয়কে বহন করবার যে প্রক্রিয়া সেখানে ছন্দের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। আমাদের প্রত্যেকের অনুভূতি এক বিশেষ মাত্রায় বিশিষ্ট থাকে। একজনের অনুভূতি থেকে বিষয় জন্ম নেয়, সাহিত্য নামক প্রক্রিয়ায় যে বিষয় আরো অনেক অনুভূতির মধ্যে পৌঁছে যায়। অনুভূতি থেকে বিষয় তথা শব্দস্ফোট সমষ্টি আবার অনুভূতির কাছে ফিরে যায়। যেখান থেকে এবং যেখানে—এই দুই প্রান্তের যোগাযোগকারী এই শব্দস্ফোট যদি সমমাত্রিক বিশিষ্ট না হয় তবে কোথাও একটা বিচ্ছিন্নতা কাজ করবে এবং সাহিত্য ব্যাপারটা ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই মাত্রা অন্তর্নিহিত গূঢ় ছন্দের সাহায্যে যা প্রবহমান, যেমন শব্দস্ফোটে তেমনি লেখক এবং পাঠকচৈতন্যে। শব্দস্থাপনের অভিজ্ঞতা থেকে একমাত্র এই গূঢ় ছন্দ সম্পর্কে মর্ম বোঝা যায়। যেমন অনেক সময় একটি শব্দ তার পাশের শব্দটিকে যেন সহ্য করতে পারেনা, মুখ ফিরিয়ে থাকে। বিশেষ করে লেখক শব্দ সম্পর্কে খুব বেশী সচেতন হলে এটা তাঁর কাছে ধরা পড়ে। যত অভিজ্ঞ হওয়া যায়, শব্দের গূঢ়তম ছন্দ পর্যন্ত অনুভব করা যায়। এবং অনেক সময় অনেক শব্দসমন্বিত কোন বিষয় যেন স্বচ্ছন্দ প্রকাশ হতে পারল না। এটা সব মিলিয়ে সমমাত্রিক হয় নি, এই জন্যে।

সাহিত্য নামক সৃষ্টির উপায়টিতে শব্দের এইরকম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। প্রয়োজনে লঘু প্রয়োজনে ভারী তার প্রতিবেশীদের প্রতি ব্যবহার, তার চলার ছন্দ, তার গতি। এসবের মাধ্যমে একএকটি শব্দস্ফোট তাদের পূর্ণ প্রকাশশক্তি নিয়ে সাহিত্য নামক বাহনটিকে উপযোগী করে তোলে, সাহিত্য নামক মাধ্যমটিকে যথার্থ করে তোলে এবং একটি জাতির সংস্কৃতিকে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রকৃত প্রতিফলক হয়ে উঠতে সাহায্য করে।

৩

একটি সমাজ অথবা একটি জাতি অস্তিত্ব লাভ করে অনেকগুলি মানুষের সংঘবদ্ধ, পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপের সূত্রে। কোন মানুষ এককভাবে বাঁচতে

CENTRAL LIBRARY

পারে না। তাকে অপরের সঙ্গে যে কোন প্রকারে সংযুক্ত হতে হয়। এক বা একাধিক সূত্র যা দিয়ে সে নিজের কিছু কিছু অপরের কাছে পেঁাছে দেয় এবং কিছু কিছু অন্যের কাছ থেকে গ্রহণ করে। এইরকম অনেক স্থলে আদানপ্রদান আমরা নিয়ত চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করি। এছাড়া আরো অনেক সূক্ষ্ম আদানপ্রদান যার মাধ্যমে বস্তুত সেই জাতি বা সমাজের সংহতি গড়ে ওঠে। সেইসব আদানপ্রদান যা মূলত মানসিক। ভাষা তার প্রধানতম সূত্র। এই ভাষা মানুষে মানুষে সংযোগ স্থাপন করে। অলৌকিক একজন আরেকজনকে জেনে নেয়। মানুষে মানুষে দূরত্ব কেমন অলৌকিক যোগ করে কাছাকাছি করে। এই ভাষা চাক্ষুষ তেমন কিছু না। নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে কিছু দৃশ্যচেহারা লিপিতে স্থাপন করে গচ্ছিত রাখা। আর মাত্র শব্দ। যার মাধ্যমে ভাষা প্রথমে ধ্বনি তার পরে শব্দস্ফোট।

এই অলৌকিক সূত্র মানুষের মন থেকে মনে চেতনার মধ্য দিয়ে অভিন্ন অস্তিত্ব গড়ে তোলার দিকে এগিয়ে যায়। একটা অপ্রত্যক্ষ গণ্ডী যার ভেতরে খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করা। ক্রমশ এই গণ্ডী যার মূলে এই ভাষা, একটা সমাজ বা জাতিকে স্বতন্ত্র চেহারা দিয়ে দেয়।

ভাষা এইভাবে প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করে। একটি সমাজ বা জাতি নিজেদের আবদ্ধ রাখে ভাষার সূত্রে। এবং এই সংযোগ মানুষকে প্ররোচিত করে। আরো এগিয়ে আবার পথ প্রসারিত হয়। এই সংযোগ, এই ক্রমশ একীকরণ, মানুষের কাছে অনেক রহস্য সমবেত করে। মানুষ ভাবে, গোপন আস্বাদ পায়। সে প্ররোচিত হয় সেই গূঢ় আবিষ্কারের জন্যে। সেই গূঢ় প্রকাশের জন্যে। তার হাতের কাছে প্রাথমিক হাতিয়ার এই ভাষা। কিন্তু প্রকাশের জন্যে এই ভাষার সে স্বচ্ছন্দ বোধ করে না। তাকে সংস্কার, প্রকাশের উপযোগী করে তোলে। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই ভাষার ধারণাশক্তি আসে। অনেক সময় এই বাঁধনে সে এত জড়িয়ে পড়ে, প্রকাশের বিষয় ভুলে যায়। বস্তুত আমাদের চারপাশে এই যে স্পষ্ট তার আড়ালে অস্পষ্ট ক্রমাগত আকর্ষণ করে, যেমন ঘেরা আলোর চারপাশে বিস্তৃত অন্ধকার। স্পষ্ট থেকে অস্পষ্টের দিকে আমরা সবসময় স্পষ্ট অস্পষ্টের মাঝামাঝি আলো

আঁধারে রহস্যের মধ্যে। রহস্যের মুখোমুখি এসে তার প্রকাশের ব্যাকুলতা। সব মিলিয়ে ভেতরে সৃষ্টির একটা আনন্দময় অবস্থা। এবং সেই প্রকাশের উপযোগী এই মাধ্যম খুঁজে নেয়া।

আমাদের এই যে নান্দনিক উৎসার তার একটি প্রকাশ সাহিত্যে।

প্রতিটি জাতি তার সাথে বহন করে সংস্কৃতি। দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যে যে অংশটুকু সেই জাতির নিজস্ব এবং বিশিষ্ট, সংস্কৃতি বস্তুত সেই অংশটুকু। আপাতচোখে এমন মনে হয়, সেই নিজস্ব এবং বিশিষ্ট অংশটুকু নেহাৎ বাহুল্য। এমন মনে হওয়ার কারণ দৈনন্দিনে আমরা এত সময় ব্যয় করি যাকে অনিবার্য মনে হয়। কিন্তু আসলে একটি জাতি বেঁচে থাকে তার সংস্কৃতির মধ্যে এবং যখন একজন অথবা একটি জাতি অথবা একটি বিশ্ব স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে তখন সেই বিশিষ্টকে অনিবার্য হয়ে যেতে দ্যাখা যায়। আপনি ঘরে থাকেন, খাওয়া দাওয়া করেন। হয়তো এটা অত্যন্ত জরুরী কিন্তু আপনার ঘরের পারিপাট্য, খাওয়ার বৈশিষ্ট্য এসব আপনাকে চিহ্নিত করবে। এমন কি এই সামান্যও সংস্কৃতির অঙ্গ হয় এবং এই সংস্কৃতি সময়ের সঙ্গেসঙ্গে আরো উন্নত বা বিবর্তিত হয়ে জাতির পথ নির্দেশ রাখে। একটি জাতি তার দৈনন্দিন ক্লান্তির হাত থেকে সেটা বাঁচিয়ে নিজের মৌল সংস্কৃতির কাছে গচ্ছিত রাখে।

সাহিত্য এই সংস্কৃতির একটি অঙ্গ। কারণ মানুষের তথা সার্বিকভাবে জাতির গোপন এবং রহস্যময়তা তুলে নিয়ে এসে সাহিত্য স্বতন্ত্র করে রাখে, সেই জাতিকে অবকাশ দেয়। কেউ বলতে পারেন অনেক অনগ্রসর জাতির কিছু না কিছু সংস্কৃতি থাকে কিন্তু সাহিত্য থাকে না। কথাটা এই জন্যে ঠিক নয়, সাহিত্য চর্চার অভাবে হয়তো তাদের লিপিতে গচ্ছিত নেই কিন্তু তাদের শ্রুতিপরম্পরায় আছে যা চলে আসে উপকথা ছড়া গান ইত্যাদিতে। এসব ভিন্ন কোন জাতি আছে কিনা নৃতত্ত্ববিদেরা বলতে পারেন, কিন্তু আমার জানা নেই। সাহিত্য যেহেতু সংস্কৃতির অঙ্গ, ভাষার মূল উপাদান শব্দ এই সাহিত্যেরও মূল উপাদান। সংস্কৃতির বিবর্তন অর্থে সাহিত্যের বিবর্তন। অতএব ভাষার মধ্যে সংস্কৃতি তার সুস্পষ্ট ছাপ রেখে

CENTRAL LIBRARY

যায়। বস্তুত বিবর্তন তো অনেকাংশে প্রকাশমাধ্যমে ঘটে, ফলে ভাষাকে সেই চিহ্ন ধারণ করতে হয়।

আমাদের যা অন্তর্নিহিত প্রত্যহের অবধারিত ক্লান্তির আচ্ছন্নে তা প্রকাশ হতে পারে না। তার একটা অন্যত্র প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যা ক্লান্তির ঘটনাসকল এঁড়িয়ে অবস্থান করবে এবং দৈনন্দিনের ফাঁকে ফাঁকে অবকাশ পাবে। এগুলি একটি জাতির মধ্যে সমবেত হয় এবং চিহ্নিত হয়ে ওঠে। এটাই আশ্চর্য, যা গোপন যা মৌল তাকে অবসর করে ভেদ করে বাইরে পরোক্ষ-ভাবে আসতে হয় এবং প্রাত্যহিক ছাড়িয়ে এই পরোক্ষ জাতিকে নির্দিষ্ট করে।

হয়তো সেই গোপনের সরাসরি প্রকাশ করা যায়না। তার জন্যে শিল্প শৈলী অর্জন করতে হয়। এই কারণে সাহিত্যে শব্দচর্চা অত্যন্ত জরুরী। সাহিত্যে যে গোপন এবং অন্তর্নিহিত বলা হবে তা সহজ না। যে কারণে প্রত্যহে সে সব আড়ালে থাকে। রোজকার কথাবার্তার শব্দ যে সব প্রকাশে তেমন উপযোগী নয় এবং শব্দ সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান অর্জন করা, তাকে যথাযথ ব্যবহার করা এইভাবে শিল্পশৈলী অর্জন করা সাহিত্যের ক্ষেত্রে জরুরী হয়ে পড়ে। ফলে শব্দ বদলায়, নতুন চেহারা নেয়, নতুনভাবে গড়ে। শব্দ যত গোপন প্রকাশে উপযুক্ত হয় সাহিত্যের পরিধি তত বাড়ে। এইভাবে সাহিত্যে যত বেশী জাতির প্রতিনিধিত্ব করবে শব্দ তত বেশী সমৃদ্ধ বিচিত্র এবং ব্যাপক হয়ে উঠবে। শব্দ যেহেতু ভাষার উপাদান, এইভাবে ভাষাও ব্যাপক এবং সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে থাকবে।

তবু সাহিত্য ভাষার অন্তি অবস্থাকে অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। কারণ সাহিত্য অর্থে প্রকাশ। প্রকাশ করতে শব্দ। শব্দ সেই ভাষার গণ্ডীর মধ্যে। অতএব সাহিত্যকে সেই গণ্ডীর ভেতরে ঢুকতে হয় এবং নিজেকে সাজাতে হয়। এবং সেখানে সাজাতে গিয়ে তার প্রয়োজনে হয়তো নতুন প্রবর্তন করতে হয়। তা যেভাবে হোক। এইভাবে ভেতরে ভেতরে পরিবর্তন ঘটে যায় এবং নতুন ভাষার জন্ম হয়। পরবর্তী সাহিত্যকে আবার এই ভাষার গণ্ডীতে ঢুকতে হবে এবং ভাঙচুর করে নতুন গড়তে হবে।

আসলে যখন মাত্র অনুভূতি, আমি থেকে তা স্বতন্ত্র কিছু না। তাকে স্বতন্ত্র করতে হবে আমি থেকে। সাহিত্যের জন্যে। এটা বিষয়ের সূক্ষ্ম অংশ। এবং এটা স্বগত উচ্চারণের মধ্যে থাকে। এই উচ্চারণ করতে ভাষার অন্তি অবস্থার সাহায্য নিতে হয়। কারণ এটা তখনো আঙ্গিকে পড়েনি যে প্রয়োগরূপ প্রত্যক্ষ করা যাবে। সূক্ষ্ম বিষয় তৈরী হয়ে গেলে এবং প্রকাশের উপযোগী মনে হলে, যেসব শব্দ বর্তমান তার মধ্যে অসুবিধে হলে, নতুন নির্মাণের কথা লেখককে ভাবতে হয়। এই নতুন নির্মাণ সমবেত ভাবে এবং লেখক-পাঠকের বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে, ক্রমে ক্রমে ভাষার পুন-র্নির্মাণ। এমন ঘটে, সাহিত্য ভাষার অন্তঃপুরে বিনীতভাবে প্রবেশ করে। তারপর তার ভেতর তোলপাড় করে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে সগর্বে বেড়িয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলা ভাষায় কি কাণ্ড ঘটিয়ে গেছে, সেখানে আমরা এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাব।

ভাষার সাথে সমাজ বা জাতির কি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকতে পারে একটু তলিয়ে দ্যাখা যাক। একটি জাতি অর্থে আমরা কি বুঝি? একটা অদৃশ্য গণ্ডী যার একটি ভৌগোলিক সীমারেখা আছে। অবশ্য এই ভৌগোলিক সীমারেখা চূড়ান্ত কিছু নয়। একই জাতি দুই রাষ্ট্রে বসবাস করতে পারে। যেমন বাঙালী জাতি ভারত ও বাংলা দেশ এই দুই রাষ্ট্রে আছে। এই অদৃশ্য গণ্ডী যার ভেতরে অনেক মানুষ। এরা এক হয়েছে। কারণ এদের একটা মাধ্যম আছে যাতে সবাই নিজেদের প্রতিফলিত করে যতটা সম্ভব কাছাকাছি আসতে পারে। এই মাধাম, এই প্রতিফলকটি হচ্ছে ভাষা। একভাষাভাষী সেই জাতিকে বুঝতে হলে, জানতে হলে সবচেয়ে সহজ উপায় সেই ভাষা আয়ত্ত করা অর্থাৎ নিজেকে সেই প্রতিফলকে প্রতি-ফলিত করার কায়দা জেনে নেয়া। অবশ্য কাছাকাছি না এসেও সেই জাতিকে জানবার অনেক উপায় থাকে। সেইসব প্রধানত সংস্কৃতির সূত্র যেখানে ভাষারও কিছু ভূমিকা আছে।

অতএব একটি জাতির প্রায় সমস্তটা ভাষায় উঠে এসে অবস্থান করে। ঠিক যেমনভাবে সেই জাতির মানুষদের আশা আকাঙ্খা, যে কোন অনুভব,

অভ্যন্তরবিশেষ সাহিত্যে সেই ভাষা তথা তার উপাদান শব্দের মাধ্যমে এসে অবস্থান করে। কারণ আমরা দেখেছি সঠিক শব্দচর্চা করে আমরা আমাদের গোপন অনুভূতিগুলি, যা অন্যভাবে প্রকাশ করা যেত না, দৈনন্দিন অভ্যেসের একটানা থেকে মুক্তি পেয়ে সেইসব সাহিত্যে প্রকাশ করতে পারি। এইভাবে একটি জাতি এবং তার অন্তরঙ্গ আকাঙ্খাসকল সেই জাতির ভাষা এবং সাহিত্যে তাদের প্রতিফলন ঠিক ঠিক রাখে। এই দুয়ের উপাদান তথা মাধ্যম শব্দ।

মানুষ সভ্যতার আদিম থেকে জন্মেই দেখেছে বহু হয়ে বিভক্ত রয়েছে। তার ইন্দ্রিয়গুলি তাকে নানাভাবে পৃথিবী চিনিয়েছে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমরা খুব দ্রুত সবাই মিলে একজায়গায় পৌঁছে এক হতে চাই। একটি মানুষ আর একটি এবং আরো অন্যান্য মানুষদের দেখে চিনতে পেরে খুব দ্রুত তাকে জানতে চায়। তার কাছাকাছি চলে যেতে চায় আর এর জন্যে প্রয়োজন উপযুক্ত যোগাযোগের উপায়। যা আমি অন্য মানুষের ভেতর দেখতে পাচ্ছি না অতএব তা অন্ধকার। আমি সেখানে আলো ফেলে বুঝে নিতে চাই। এই যোগাযোগের উপায় হিসেবে মানুষ, শুধু মানুষ কেন সমস্ত প্রাণী, প্রথমে অবলম্বন হিসেবে বেছে নিল ভাষাকে। যার দ্বারা আমি আমার ভেতরটা অন্যের কাছে পেঁাছে দিতে পারি। পরিবর্তে সে তার ভেতরটা আমার কাছে পেঁাছে দিতে পারে। এই বিনিময় সব মানুষকে কাছাকাছি করে। তাদের সাধারণ সুখ দুঃখকে ঘিরে একটা জাতি গড়ে ওঠে। একটি জাতির অস্তিত্বের জন্যে এইভাবে ভাষা তার ভূমিকা রাখে।

কিন্তু এ হোল সাধারণ যোগাযোগের উপায়। দৈনন্দিন বিনিময়ের বেসাতি। ক্রমে মানুষ তার ভেতর অন্বেষণ করতে করতে এমন দুর্গমে পেঁাছে যায় যা এই বিনিময়ভাষার যেমন তেমন ব্যবহারে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। অথচ দৈনন্দিনকে ছাড়িয়ে সেই মানুষ এবং পরম্পরায় সেই জাতি সেই সেই গোপন সমূহ যা দুর্গমে নিহিত আছে, সেই সমূহে নিজেদের মৌলকে আবিষ্কার করে। সেসব নানাভাবে বাইরে উদঘাটিত করে নিজেদের স্থাপন করে।

সাহিত্য এর অন্যতম উপায় । যা সেই জাতিকে সমৃদ্ধ করতে, বিশিষ্ট করতে সাহায্য করে ।

ভাষা অর্থে সাধারণভাবে আমরা সমন্বিত শব্দ বুঝি । আরো স্পষ্ট বলতে গেলে শব্দস্ফোট । অর্থাৎ সবাই মেনে নিয়েছিল এমন বর্ণমালার সমষ্টি সেই শব্দসকল, যা অর্থ বহন করে । কিন্তু এতো অনেক পরের কথা । কারণ সবাই যে মেনে নিয়েছে এর আগে তারা নিশ্চই কোন দিন কাছাকাছি এসেছিল । তারপর একে অপরকে বুঝতে চেয়েছিল । এবং আংশিক হলেও একজন আরেকজনকে বুঝতে পেরেছিল । তারপর নিজেরা সমঝোতায় এসে একটা যৌথ ভাবনা গড়ে তুলেছিল । যা এই বর্ণমালা সৃষ্টি করে তাদের অনুমোদন করেছিল ।

এতসব ঘটে যাবার শেষে এই অনুমোদিত অক্ষরসমূহ । এর আগে একে অপরকে বুঝতে পেরেছিল । কিভাবে ? কি সেই মাধ্যম যা আদিতে ছিল এবং নিজেদের মধ্যে ভাব আদান প্রদানের বাহন ছিল ? এযেন একরাশ ছড়ানো পাথর যা থেকে প্রয়োজনমত কেটে ছেঁটে ভেঙে গড়ে জিনিষপত্র তৈরী করে নেয়া । এইরকম ছড়ানো ছিল ধ্বনিসকল যা থেকে পরে সঠিক প্রয়োজন বুঝে নিয়ে সেইমত সমঝোতায় এই সমস্ত অক্ষর সমূহ এবং তা থেকে শব্দস্ফোট যা ভাষার একটি গঠিত রূপ । আদিম ধ্বনি ছিল শারীরিক । তখন সবকিছু ছিল শারীর নিরিখে । পরে মানুষ যত বেশী মানসিক হতে থাকল তার ভাব এবং প্রকাশ হল বিচিত্র এবং এই সমস্ত শব্দস্ফোট সৃষ্টি হতে থাকল ।

যাঁরা প্রাণীবিদ তাঁরা স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন একটি বাঘ তার বিশেষ একটি গর্জনে মনের কি ভাব ব্যক্ত করছে অথবা কোন আর্তনাদে কুকুরটার যন্ত্রণা প্রকাশ পাচ্ছে । একটি কাকের ডাক শুনে আমাদের অনেক সময় নির্জন দুপুর বা শেষরাত্রির কথা মনে হয় । কোকিলের ডাক শুনে বসন্ত কালীন অনুভব এসে যায় । এমন কি কোন বিশেষ যন্ত্রের আওয়াজ শুনে সেটার শারীরিক কি অবস্থা একজন যন্ত্রবিদ ঠিকঠাক বলে দিতে পারেন । আসলে সেই সমস্ত ধ্বনিকে প্রথমে অনুসরণ তারপর অনুধাবন এবং শেষে

অনুশীলন করে তবে তাদের গূঢ় ভাবে জানা যায়। প্রকৃতিতে বস্তুত এই রকম বিচিত্র ধ্বনিসমূহ তথা শব্দসকলের সমাহার আছে যা আমরা আমাদের দৈনন্দিন থেকে নিজেদের সরিয়ে কান রাখলে শুনতে পাই অর্থাৎ দৈনন্দিন থেকে অন্যমনস্ক হলে জানতে পাই। এই শব্দসমূহ প্রকৃতির অনুভবকে এক অস্ফুট ভাষায় প্রকাশ করে চলেছে, আমরা যার খবর রাখি না ব্যস্ততায়। কেউ কেউ তার আংশিক বোঝবার চেষ্টা করি প্রবল অনুশীলনের মাধ্যমে। এই শব্দসকল প্রায় সবটা অনুভবের, আত্মস্থ হবার। নিজের ভেতর থেকে বাইরে প্রকাশের জন্যে এই শব্দ নয়। অর্থাৎ এই শব্দসমূহ সাহিত্যের নয়। সাহিত্যের শব্দ শব্দস্ফোট বহন করে।

আমরা যে সবসময় প্রকাশ করতে উন্মুখ এটা ঠিক না। অনেক সময় আমরা আত্মমগ্ন থাকি, অনুভব করি। তখন বরং প্রকাশের বিরোধিতা করে থাকি। সে অবস্থায় একরকম সুখ। কিন্তু এই সুখের অভাব ঘটলে অর্থাৎ যখন আর আত্মমগ্ন থাকতে পারি না, যখন অনুভব জ্বালাময় হয়, তখন প্রকাশের কথা মনে হয়। বস্তুত আমাদের মধ্যে বিষয় অনুভূতি ইত্যাদি যখন ধারণ করতে পারি না তখন প্রকাশ করতে বাধ্য হই।

অনেক সময় আনন্দের আতিশয্য হলেও আমরা তা ধারণ করতে পারি না এবং প্রকাশ করতে বাধ্য হই। এই প্রকাশ অবশ্য তাৎক্ষণিক এবং কোন নিয়মকানুন বা শিল্পের ধার ধারে না। কারণ এত দ্রুত কোন গড়ন হতে পারে না। একটা অদ্ভুত প্রকাশ হয় মাত্র। কিন্তু যে প্রকাশ সুখের অভাব থেকে ঘটে তা এত দ্রুততা নিয়ে উন্মুখ হয় না। অনুভবের জ্বালা সে বিষয়কে অনুভবের আরো গভীরে নিয়ে যায়। যতক্ষণ না প্রকাশের পূর্ণরূপ গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় দর্শন সাহিত্য এবং নানাধরনের চিন্তা সকল ব্যর্থতা থেকে, বেদনা থেকে, বিচ্ছেদ থেকে, সুখের অভাব থেকে উদ্ভূত হয়েছে। অবশ্য কখনো কখনো কোন প্রকাশ আপাতআনন্দময় মনে হয়। কিন্তু এমনও হয় কোন দুঃখ গভীর থেকে গভীরতর হতে হতে এক সময় আত্মময় এবং প্রকাশের সময় আনন্দময় হয়ে ওঠে।

সাহিতো এই ভাবে প্রকাশ ঘটে ভাষার, যেসব শব্দস্ফোট সঞ্চিত করেছে

CENTRAL LIBRARY

তার মাধ্যমে। অক্ষরের সংখ্যা সীমিত এবং শব্দস্ফোটও অসীম নয়। অতএব প্রকাশের বিষয় সীমিত হয়ে পড়বে। কিন্তু আমরা দেখেছি যখন অনুভূতির গভীরে আমরা পৌঁছতে চেষ্টা করি তার সীমার দিকে আমরা এগোই না। যত এগোই তা তত ব্যাপক হয়ে ওঠে এবং আমাদের চলা তখন অসীমের দিকে ধেয়ে যায়। মনে হয় যেন এখানে একটা আপাত বিরোধ গড়ে উঠল। বস্তুত ব্যাপারটা এমন না। এই পৃথিবীতে অসংখ্য বস্তুকণা যার মৌলিক উপাদান মাত্র দুটো। তিনটে। একই বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন সংখ্যায় নিজেদের সাজিয়ে এই অসংখ্য বস্তুকণার জন্ম দেয়। এই শব্দসমূহ বিভিন্নভাবে এবং উপযোগীভাবে স্থাপন করতে পারলে এই ক্রমশ ব্যাপক ক্রমশ অসীম অনুভূতিসকলের প্রকাশরূপ হতে পারে। ভারতীয় দর্শনে শব্দব্রহ্মের যে কথা বলা হয়েছে তা হয়তো একথা বলে যে, এই শব্দ তার মৌলিকরূপ এমনকি ব্রহ্মেরও প্রকাশরূপ হতে পারে।

শব্দ কোথা থেকে কেন সাহিত্যে এই প্রশ্ন আমাদের সামনে চক্রাকার এক পরিক্রমা উপস্থিত করে। মানুষ তার আদিম অবস্থা থেকে কখনো আত্মমগ্ন, কখনো আনন্দের আতিশয্যে আকুল, কখনো যন্ত্রণাময়। কখনো আত্মমগ্ন অনুভবের মধ্যে। কখনো আনন্দের আতিশয্যে একটা অদ্ভুত প্রকাশ, যেন ভেতর থেকে সহসা কিছু বাইরে বেড়িয়ে আসা। কিন্তু যখন যন্ত্রণাময় ? অনুভবের গভীর থেকে ক্রমশ আরো গভীর। এক সময় প্রকাশে উন্মুখ হলে ভাষা বাইরে তা প্রকাশ করে। এই ভাষা শুধু ধ্বনিময়। ক্রমে সবাইকে কাছাকাছি করে। একটা যৌথ ভাবনা গড়ে ওঠে। এই যৌথ ভাবনা কেবল ধ্বনিময়কে ভেঙে কেটে গড়ে অক্ষর এবং শব্দস্ফোট সৃষ্টি করে পারস্পরিক বোঝাপড়ায়। শব্দসমূহের চর্চা অনুধাবন অনুশীলন—এসবের দ্বারা নিজেদের গোপনকে প্রকাশ করবার উপযোগী মাধ্যম করে নেয়।এবং সাহিত্য সৃষ্টি হয়। সাহিত্য নিজের প্রয়োজনে শব্দসমূহ যথার্থ ব্যবহার করে, প্রয়োজনে তাদের নতুন করে গড়ে নেয়। এই নতুন নতুন অনুভবের প্রকাশশক্তি শব্দের আভ্যন্তরীণ শক্তিকে ক্রমশ আরো উদ্ঘাটিত করে। শব্দের শক্তি, ভাষার ভূমিকা আরো ব্যাপক করে। ভাষা এইভাবে আরো সমৃদ্ধ হয়। সেই সঙ্গে ভাষার

CENTRAL LIBRARY

উচ্চারণ তথা ধ্বনির মাত্রা সাহিত্যের প্রয়োজনে ভাষার সঙ্গে সংযোজিত হয়। প্রতিটি ভাষায় তার ধ্বনির বিবর্তন আমরা লক্ষ্য করে থাকি। এবং এইভাবে ধ্বনি থেকে ভাষা ইত্যাদি সেই চক্রাকার পরিক্রমার মধ্যে প্রশ্নের ঠিক উত্তর খুঁজতে গিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে পারি মাত্র।

অতএব শব্দ কোথা থেকে? অনন্ত থেকে। কেন সাহিত্যে? যেহেতু তা অনন্ত অনুভব প্রকাশ করতে উন্মুখ। এবং আমরা এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে উত্তর দিতে পারি না। মাত্র নিমগ্ন হতে পারি।

CENTRAL LIBRARY

পুণ্যশ্লোক রায়

# শব্দার্থের প্রকৃত রূপ

ভাষা শেখার সময় ব্যাকরণের চেয়ে অভিধান বেশী কাজে লাগে। এবং যে ব্যাকরণে কেবল নিয়ম উল্লেখ করা আছে তার চেয়ে বেশী কাজে লাগে যে ব্যাকরণ উল্লেখ করে শব্দ কিভাবে নির্বাচন এবং প্রয়োগ করা হয় একাধিক অর্থে। তবু Leonard Bloomfield-এর মতন ভাষাবিজ্ঞানী বলেন শব্দ বা পদরূপ কি অবস্থাতে ব্যবহার হয় এবং তার প্রতিক্রিয়া কি না জানলে তার অর্থ ভালো করে বোঝা যায় না। যে শোনে সে কি রকম সাড়া দেয়? সব অবস্থাতে মানুষ কথা বলে ও সাড়া দেয়. অবস্থা ও সাড়া দেওয়ার সঙ্গে জগতের সামগ্রী জড়িত। অথচ জগতের সামগ্রী বুঝতে হলে যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দরকার সাধারণ মানুষের তা নেই। যা জানা সম্ভব বা উচিত তার খুব সামান্য অংশ সে জানে। এই কারণে Bloomfield বলেন শব্দ বা পদের অর্থভেদ ভাষাতত্ত্বের সবচেয়ে অবহেলিত ক্ষেত্র। এর তাৎপর্য সহজেই অনুমান করা যায়।

যা জানার প্রয়োজন বেশী তা ভাষাতত্ত্বে অবহেলিত। দুঃখের কথা ঠিকই, তবে জগতের সামগ্রীর কোনো সীমা নেই। জগত অপরিমিত। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেরও কোনো সীমা নেই। শব্দার্থচর্চা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী রাখতে হবে যদি অবহেলার ওপরে এতো জোর

দেওয়া হয়। ভাষাতত্ত্বে শব্দার্থ অবহেলিত এইটা স্ফোটনশীল একটা ধারণা।

দুটি জিনিষের মধ্যে Bloomfield গোলমাল করে ফেলেছেন। সেই দুটি এই ঃ বিনা প্রমাণে যা স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং যা কিছু এখনও অনাবিষ্কৃত। অসীমের সঙ্গে যা কিছু বড় তাও তিনি গোলমাল করে ফেলেছেন। হয়ত তিনি মনে করলেন বস্তু বা দ্রব্যের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে অসীমে এসে ঠেকবে। অসীমের মধ্যে শব্দার্থের একটা নির্দিষ্ট রূপ দেওয়া যায় না দেবতার দয়া না হলে। Bloomfield-এর পরে যাঁরা গবেষণা করতে এলেন তাঁরা এটা না দেখে পারলেন না। দেবতার দয়া না হলে কোনো অর্থের এত টুকু আভাস পাওয়া যাবে না। Bloomfield এটা বোঝেন নি শব্দার্থচর্চা কোনো স্থান পাবে না ভাষাতত্ত্বে যদি এটা স্বীকার না করা হয়। শব্দ বা পদের অর্থ—এখন যা তাই থেকে যাবে —একটা ভোঁতা ও মোটা উপায় বা কৌশলমাত্র।

বাস্তব অভিজ্ঞতা ও শৃঙ্খল-সঙ্গত পদ্ধতির মধ্যে এই মিলের অভাব থাকা সত্ত্বেও এর সম্বন্ধে সকলেই নীরব। কেউ যদি এই দিকে পা বাড়ায়, সে নিষ্ফল হয়ে অবিলম্বে হটে আসে। ভাষাতত্ত্ববিজ্ঞানী খুশিমনে নানা ভাষা শিখতে থাকেন, বলতে থাকেন, তর্জমা করতে থাকেন এবং টীকা রচনা করতে থাকেন। যাঁরা অভিধান বানান বা ব্যাকরণের সংজ্ঞা লেখেন তাঁদের মতন ভাষাবিজ্ঞানী কাজ করে যান। যাঁরা ভাষাবিজ্ঞানী নন, তাঁরা নির্ভয়ে শব্দ বা পদের অর্থ বর্ণনা ও বিচার করতে থাকেন। তাঁদের কোনা দ্বিধা নেই। শব্দ বা পদের মানে ভালোভাবে বা চলনসইভাবে বা অল্পবিস্তর ভাবে দরকারী কি অদরকারীভাবে বোঝানো হয়েছে কিনা তাঁরা তা দেখেন না। ভাষাতত্ত্ববিজ্ঞানী এরকম করতে পারেননা। তিনি বাধ্য হন তাঁর মতামতের হেতু দিতে। তাঁর চিন্তাধারা মার্জিত ও সংস্কৃত করে রাখা তাঁর একটা কর্তব্য। তিনি বিচার করে দেখেন বলেই তাঁর মত বিচার্য।

শব্দ বা পদের মানে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য শব্দার্থতত্ত্বের প্রয়োজন নেই। যেমন নীতিতত্ত্বের প্রয়োজন নেই সাধারণভাবে ঠিক পথে চলতে। বা যেমন

বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য epistemology-র প্রয়োজন নেই। আজকাল ভদ্রতার খাতিরে নিত্য একটু আধটু কপটতা করতে হয়। তবে যে যাই বলুক, কাজের বেলায় ভণ্ডামি চলে না। শব্দার্থের প্রকৃতরূপ কি বোঝবার প্রয়োজন যদি কারু হয় তবে বুঝতে হবে কপটতা দেখে দেখে মন ক্লান্ত হয়েছে। বুদ্ধিকে সব ক্ষেত্রে বর্জন করলে কি বিজ্ঞানের উন্নতি হয়? শব্দার্থের প্রকৃতরূপ জানতে চাই বলে এই সমস্যা জটিল। শব্দার্থের প্রকৃতরূপ জানা নেই। এক এক বস্তুর সঙ্গে এক এক শব্দ বা পদের এমন মিল থাকা দরকার যে সেই শব্দ বা পদ শোনামাত্র সেই বস্তু দেখাতে পাওয়া যাবে। শব্দার্থের প্রকৃত রূপ বলে কিছু থাকবে যদি এইটি সম্ভব হয়। স্বতন্ত্রভাবে দেখবার ক্ষমতার ওপর জোর দিতে হবে। এক একটা শব্দ বা পদের সঙ্গে অনেক বস্তু বা বিষয় জড়িত থাকবে তা না হলে। শব্দার্থের জগত অসীম জগতের সঙ্গে মেলানো চাই। বিশেষ জগতের সঙ্গেও। শব্দার্থের একটা হদিশ পাবো যদি এমন একটা বিশেষ শ্রেণীর দ্রব্য পাওয়া যায় যাকে স্বতন্ত্র ভাবে দেখানো সম্ভব, অঙ্কের সাহায্যে বা অঙ্ক বাদ দিয়েই। তা হলে তার প্রকৃত রূপ বাস্তবিক কি জানতে পারব।

তবে মূল প্রশ্নের কাছে শব্দার্থের রকমসকম গৌণ। শব্দার্থ এক একটা দ্রব্য হবে কিনা বা সম্বন্ধ প্রকাশক হবে কিনা কিংবা কারক বা প্রতীক বা সাড়া অথবা কার্য সম্বন্ধীয় প্রতিক্রিয়া বা কার্যফল বা প্রভাব, শক্তি, বৃত্তি, গতিক দেশ বা অবস্থা, বা অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য, বা লক্ষ্য বা উদ্ভাবনের কল্পনা —এই সবই গৌণ।

মূল প্রশ্নের উত্তর চাই। প্রশ্নটা এই: কোনো প্রণালী কি আছে যার সাহায্যে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে অর্থ অন্তর্গত বা বহির্গত করতে পারা যায়? যদি এমন প্রণালী থাকে তা হবে শব্দার্থের একটা মানচিত্র। এই নিয়ে কোনো গবেষণা হয় নি।

শব্দার্থের রূপ এতো থাকতে পারে যে একটার গায়ে আর একটা এসে পড়ে, বা একটার সঙ্গে আর একটা গুলিয়ে যায়। আঙুল দিয়ে আমরা দেখাতে পারি cat মানে কি বা shoes মানে কি, কিন্তু আঙুল দিয়ে দেখাতে

পারি না unicorn মানে কি। বাস্তব সংখ্যা বা real number বলতে কি বোঝায় তা আমরা দেখাতে পারব না। বাস্তব সংখ্যায় অর্থ যখন খুঁজি তখন যে প্রণালীর সাহায্যে dinosaure বা jealousy-র মানে বুঝি সে প্রণালী আমাদের কাজে লাগবে না। প্রায়ই দেখা যায় এক একটা সাধারণ শব্দের একাধিক অর্থ থাকে। আমার পাড়ায় যে বিড়াল ঘুরে বেড়ায় সে একটা cat কিন্তু বাঘও একটা cat। জাহাজে যে চাবুক দিয়ে খালাসিদের মারা হত আগেকার দিনে সেও একটা cat। এবং অন্যান্যদের দোষ ধরে যে মেয়ে ঘুরে বেড়ায় সেও একটা cat। গণিতে ফলের যে অর্থ হয় সেটা অন্য তত্ত্বে থাকে না। সব অর্থের এক রূপ নেই। খুব কমশব্দ আছে যার পরিধির মধ্যে অর্থ বিভিন্ন রূপ ধারণ করে না।

এই অবস্থার জন্য বৈজ্ঞানিক নিষ্ফলতা দায়ী নয়। কিভাবে শব্দ ও পদ ব্যবহার করি দেখা যাক। যে শব্দ বা পদের অর্থ আছে তাকে দিয়ে চারটি মূল তত্ত্ব হয়।

১। পুণর্বার প্রয়োগ করতে পারা যাবে

Pig কাকে বলি জানি। বলতে পারি this is a pig. তবে আরো বলতে হবে। বলতে হবে this is the same pig.

উপাধির বেলায়ও সেই একই নিয়ম খাটবে। অনেকবার দেখাতে পারি Harold mac Millan কে। অনেকবার পাঁচজনের মধ্যে তাঁকে খুঁজে বের করতে পারি। তাঁকে চিনতে অসুবিধা হয় না। এই দুটি কথা "Harold" এবং "mac millan" ভাষার অন্তর্গত। তারা শব্দ বা পদ। কিন্তু Harold Mac Millan একবার মাত্র দেখা দিয়ে অদৃশ্য হত যদি ওঁর নাম মনে না থাকত বা ভাষার অন্তগত না হত। বার বার শব্দ বা পদ প্রয়োগ করা চাই।

২। সীমাবদ্ধ রাখতে পারা যাবে।

"This is not a pig যখন বলা হয় pig-এর মানে সীমাবদ্ধ করা হয়। স্পষ্ট দেখানো হয় শব্দটা কোথায় ব্যবহার করা যায় না।

শব্দ বা পদের অর্থ থেকে বাদ দিতে হয় কিছু। না দিলে কোন অর্থ থাকে না। দিলে পরে শব্দ বা পদের প্রয়োগ কোথায় ও কতখানি উপযুক্ত বলতে হয় না। শব্দ ও সম্পর্কিত বস্তুর মধ্যে contrast থাকা চাই। contrsat না থাক্‌লে কোথায় থামতে হবে জানা যায় না। জানা যায় না কখন 'না' বলা দরকার। জানা যায় না কি কি বাদ দিতে হবে। শব্দ বা পদের মানে থাকলে তবে তা জানা যাবে।

৩। এক শব্দের বা পদের জায়গায় অন্য শব্দ বা পদ ব্যবহার করার ক্ষমতা থাকা চাই।

একটি বিশেষ জন্তু দেখে 'pig' বলতে পারি। সে একটা 'pig. 'pig' একটা শব্দ। 'pig'-এর জায়গায় অন্য শব্দ বা পদ বসানো যায়। বলতে পারা যায় 'this is that well-known four footed mud-loving domesticated small animal" বা অন্য ভাষায় "Dieser ist ein Schwein"। একই অর্থ অন্য শব্দে প্রকাশ সম্ভব।

শব্দ বা পদ যা উল্লেখ করে তার নানা সম্পর্ক থাকে। সেই সম্পর্ক-গুলির মধ্যে মিল যদি না থাকে অর্থ বা মানে থাকবে না, এবং অর্থ বা মানে থাকবে যদি প্রতিশব্দ বা সমনাম বা প্রতিপদ বা সমার্থক শব্দ বা দ্ব্যর্থবোধকে বা দ্বিভাবাত্মক শব্দ থাকে।

৪। শব্দের কার্যক্ষেত্র প্রসারিত করতে পারা যায়।

"This is a pig." বলতে পারি।
"This is also a pig" বলতেও পারি। বা,
"This is another kind of pig."
অনির্দিষ্টভাবে এই "pig" শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত দ্রব্যের সংখ্যা বাড়াতে পারা যায়। অন্য শ্রেণীর দ্রব্যের বেলাও তাই।

নাম বা উপাধির অর্থ সীমাবদ্ধ। কার্যক্ষেত্র প্রসারিত করা যায় না।

উপাধি বা নামের অর্থ অন্যরকম। যার নাম তার নানা কর্তব্য-কর্ম সমাজে। সে শিশু, পুত্র বা কন্যা, বালক বা বালিকা, তরুণ বা তরুণী বৃদ্ধ

বা বৃদ্ধা, মা বা বাবা ইত্যাদি। সে ডাকপিওন, কেরানী বা প্রধানমন্ত্রী। বিভিন্ন বয়সে মানুষ বিভিন্ন পদ পায়। এই সব উপায়ে শব্দের কার্যক্ষেত্র যদি প্রসারিত করতে পারা না যেত তবে এক এক নাম বা উপাধি left luggage ঘরে একটা tag-এর মতন হত। তার বেশী কিছু নয়।

এই কথা আরএকরকমভাবে বোঝানো যায়। শব্দার্থের মধ্যে কিঞ্চিৎ অস্পষ্টতা থাকে। শব্দ বা পদের অর্থের পরিধি সম্পূর্ণ জানা বা অজানা থাকলে অর্থ থাকে না।

Ferdinand de Saussure একটা প্রসিদ্ধ উক্তিতে এই কথা ভারি সুন্দর ভাবে সংক্ষেপে বলেছেন। Bloomfield ও তাঁর সমর্থন করেছেন। তিনি লিখেছেন "The construction of linguistic form with their meaning is wholly arbitrary" অর্থাৎ পদ বা শব্দের সঙ্গে তার অর্থের সম্পর্ক ইচ্ছানুযায়ী। যাকে ইংরেজীতে বলা হয় "horse" তাকে ফরাসীতে বলা হয় "cheval" বাংলায় বলা হয় "ঘোড়া"। সম্পূর্ণ খামখেয়ালিভাবে এই নামকরণ হয়েছে। কোনো ন্যায়শাস্ত্রসঙ্গত কারণ নেই, কেন এমন হবে।

কি বলা যায় এই উক্তির বিপক্ষে দেখা যাক। "horse" শব্দটা নাম হিসাবে যুক্তিসঙ্গত নাও হতে পারে। তবে "horse" শব্দ হিসাবে যেভাবে প্রয়োগ হয় তা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে।

ধরে নেওয়া যাক, আমাকে একটা ঘোড়া দেখিয়ে শিখিয়ে নেওয়া হয় "horse" এবং তার পরের মুহূর্তে আর একটি ঘোড়াকে দেখতে পাওয়া যায়। এই দ্বিতীয় ঘোড়াকে আমি বলি horse। এই ব্যবহারে কি কোনো যুক্তি নেই? দুটি ঘোড়া কি একরকম দেখতে নয়? প্রাকৃতিক মিল অনুসারে নামকরণ তো করতে হয়।

প্রাকৃতিক মিল থাকলে কার্যসম্পাদনার প্রণালীতে শব্দ প্রয়োগের একটা হদিশ পাওয়া যায়। যদি বলি "বাঁ হাত" এবং তার পরে "ডান হাত" এবং তার পরে "তার হাতের লেখা দৃঢ়" তা হলে যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রাকৃতিক মিল অনুসারে আমি "হাত" থেকে "লেখা" পর্যন্ত এগিয়ে যাই। একটা স্কুল

যদি নতুন গৃহে উঠে যায় তার নাম বদলায় না। একই নামে তার পরিচিতি হয়। নামকরণ হয় বাহিরজগতের প্রয়োজন অনুসারে এই ক্ষেত্রে। বস্তু বা বস্তুর নামের মধ্যে সম্পর্কটা খামখেয়ালি নয়। একটা শৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছে। গবেষণা করা যায় এই ধরনের দৃষ্টান্ত নিয়ে।

তবু অস্বীকার করা যায় না যে নামকরণ মূলত খামখেয়ালিভাবে হয়। অর্থের যোগে শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা থাকে। প্রশ্ন হচ্ছে ঠিক কোন খান থেকে প্রণালী গঠন শুরু হয়। শৃঙ্খলা থেকে যদি শুরু হয় আমরা টুক্‌রো টুক্‌রো মানে নিয়ে বিব্রত হব। এবং বিব্রত হব সাজানো পদ্ধতির জটিলতার পরিমাণ দেখে। এতো বিব্রত হতে হয় যে আমরা বলতে শুরু করি ভাষাবিজ্ঞান তার শিশুকাল এখনও অতিক্রম করে নি। কেউ কেউ একটা মিথ্যা বিজ্ঞান খাড়া করতে চেষ্টা করেন। শৃঙ্খলতা যদি প্রাধান্য পায় স্বাধীনতা থাকে কেবলমাত্র যেখানে শৃঙ্খলতা অকৃতকার্য হয়।

স্বাধীন বা খামখেয়ালিভাব থেকে প্রণালী গঠন যদি শুরু হয় তা হলে শৃঙ্খলার হেতু জানার জন্য কোনো বাড়তি অনুমান বা hypothesis দরকার হবে না। খামখেয়ালি ভাবের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থান পেতে পারে। স্বাধীনতা তার খামখেয়ালি ভাব নির্দিষ্ট একটা সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারে। বিস্তারের ক্ষেত্রেও খামখেয়ালিভাব কম বা বেশী রাখতে পারা যায়। শৃঙ্খলা খামখেয়ালের সুফল। শৃঙ্খলা অকৃতকার্যের ফল নয়।

প্রণালী দুই রকম দেখা যায়। একরকম স্বাধীনতাকে খর্ব করে। অন্যটা স্বাধীনতাকে সমর্থন করে। কোনো সামঞ্জস্য নেই। স্বাধীনতা যেখানে সেখানে শৃঙ্খলা সমর্থন পায়। শৃঙ্খলা যেখানে সেখানে স্বাধীনতা সমর্থন পায় না।

দেখা যাচ্ছে যদি প্রণালী গঠন শুরু করা যায় স্বাধীনতা থেকে, তবে দুটি সুবিধা আছে। অন্য কোনো অনুমান বা hypothesis দরকার হয় না। এবং শৃঙ্খলতা ও স্বাধীনতার মধ্যে যে বিরোধ তা সীমাবদ্ধ হয়।

শব্দার্থের প্রকৃত রূপ আছে বলে আংশিক ভাবে বহুরূপ প্রদর্শন করা সম্ভব। এই প্রকৃত রূপ এক নয়, একাধিক। এই রূপগুলি এক এক করে কিন্তু দেখতে হবে। ভাষাবিজ্ঞান বা শব্দার্থবিজ্ঞান দায়ী নয় এর জন্য।

দায়ী বিজ্ঞানের বহুত্বই। শব্দার্থ সম্বন্ধে যেজন কিছু জানতে চায় তাকে অনেক রকম বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হয়। যেজন তর্জমা করতে চায় বা অভিধান তৈরী করতে চায় বা ব্যাকরণবিদ্যায় সিদ্ধ হতে চায় তাদেরকেও বহুবিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হয়। সকলেরই বেলা একই বাধ্যতা। নিজের কর্মক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করতে হলে এতোরকম বিদ্যা আয়ত্ত করতে হয়, এতো বৈজ্ঞানিকপ্রণালী প্রয়োগ করতে হয় যে হয়রান হয়ে ওঠে মানুষ। এই হয়রানি বেড়ে চলেছে। বিশেষজ্ঞান সাধারণজ্ঞানের সামিল করে তুলতে হবেই। সবই প্রয়োজনীয়। এবং প্রয়োজনীয়তার পরিধি এতো বেড়ে চলেছে যে মানুষের মতন বাঁচতে হলে জ্ঞানচর্চা নিয়মিত করতে হয়।

আজ আর কেউ বিশ্বাস করে না শব্দার্থবিজ্ঞান অপরিবর্তনশীল একটি প্রকৃতির সঙ্গে মেলানো অপরিবর্তনশীল একটা প্রণালী। বিভিন্ন প্রাকৃতিক রূপ যে যার মানসিক শ্রেণীতে আবদ্ধ রাখার উপায়ও ত নয়, নতুন রূপ আটকে রাখতেও পারে না। চোখের সামনে মানুষের অভিজ্ঞতার শাখা প্রশাখা বাড়ছে, ভাঙছে এবং নতুন গজিয়ে উঠছে। শব্দার্থের একটা প্রকৃত রূপ আছে স্বীকার করার ফলে কিছু আলোকপাত হতে পারে কোনো কোনো জ্ঞানের ক্ষেত্রে। তত্ত্বের কাছে যদি দিকনির্ণয় খুঁজি তাহলে এমন তত্ত্ব চাই যে সেই তত্ত্ব থেকে আমরা জানতে পারব কেমন করে আমরা চিন্তা করতে পারি নিজেকে খর্ব বা সংকীর্ণ না করে বা পুরানো অকেজো তত্ত্বের কবলে না পড়ে বা সব তত্ত্ব ত্যাগ না করে।

CENTRAL LIBRARY

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

# ভারতীয় সঙ্গীতে শব্দতত্ত্ব ও দর্শনচিন্তা

ভারতীয় সঙ্গীতের আলোচনায় বিচিত্র দিক আছে এবং সেই সকল দিকের বা বিষয়ের আলোচনাকে নিয়েই ভারতীয় সঙ্গীত পূর্ণ। ভারতীয় সঙ্গীতের আলোচনার ক্ষেত্র সাধারণত দুটি ভাগে বিভক্ত—ফলিত বা ক্রিয়াসিদ্ধ (প্র্যাক্‌টিক্যাল) ও ঔপপত্তিক (থিওরেটিক্যাল)। এই দুটি বিভাগকে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা বলি শাস্ত্র ও সাধনা। সাধনা কিংবা অধ্যাত্মসাধনা—যা প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ক্ষেত্রকে করে প্রসারিত ও প্রদীপ্ত। দর্শনচিন্তা শাস্ত্র বিভাগেরই অন্তর্গত এবং ঐ দর্শনচিন্তাই বস্তুর ও বিষয়ের প্রাণকেন্দ্রের পরিচয় দেয়। সঙ্গীতের যে ব্যাকরণ, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, মূর্তিতত্ত্ব ও দর্শন সঙ্গীতশিল্পের বহিরাবরণের দেয় পরিচয়। আর ঐ বাহিরাবরণের উপাদান ও মাধুর্যকে যথার্থভাবে জানার ও বোঝার জন্য হাতেনাতে সঙ্গীত শিল্পের যে সাধনা সেই সাধনাই সঙ্গীত-স্বরূপের দেয় যথার্থ পরিচয়। শাস্ত্রীয় বা ঔপপত্তিকাংশ তা-ই সঙ্গীতের রক্তমাংসযুক্ত বহিরাবরণ বা কঙ্কাল, আর জীবন বা প্রাণ তার রসোপলব্ধি ও সুর-সরস্বতীর প্রত্যক্ষ দর্শন ও উপলব্ধি।

সঙ্গীতের দর্শনচিন্তার ক্ষেত্র বিচিত্র দিকে বিচিত্রভাবে প্রসারিত থাকলেও তার শব্দতত্ত্ব বা নাদতত্ত্বই বিশেষভাবে অনুশীলনের বস্তু। সঙ্গীতের প্রকৃত

স্বর সাতটি ও বিকৃত পাঁচটি, মোট বারোটি স্বরেই যে কোন রাগ ও রাগিণী লীলায়িত। রাগ সঙ্গীতের প্রাণ এবং এই স্বরকাঠামোরূপ রাগস্বরূপকে নিয়েই সঙ্গীতশিল্পের সার্থকতা তার সৃষ্টির দিকে থেকে—যদিও এই সৃষ্টি আন্তর ও বাহ্য এই দুটি দিকে প্রসারিত। এই দুটি দিকের পরিচয় দিয়ে খ্রীষ্টীয় সতেরশো শতকের সঙ্গীতশাস্ত্রী সোমনাথ তাঁর 'রাগবিবোধ' গ্রন্থে বলেছেন—সঙ্গীত নাদময় ও ভাবময়। নাদ বা শব্দময় বলতে সঙ্গীতে যে রঞ্জনাত্মক গতিশীল ও সচঞ্চল স্বর রাগের গঠন সৃষ্টি করে সেই গঠনে বা শরীরে থাকে স্বরের সঙ্গে বিচিত্র শ্রুতি বা সূক্ষ্মস্বর, আরোহী ও অবরোহী বর্ণ, দশলক্ষণ, রস ও ভাব। রাগের ঐ শব্দময় বা নাদময় রূপ, গঠন বা অবয়ব লীলায়িত হয় ছন্দে, রসে ও ভাবে তখন মনে যে সৃষ্টি হয় এক অপরূপ ভাবের ব্যঞ্জনা ও মনের প্রেরণা—সেই ব্যঞ্জনা ও প্রেরণাই সৃষ্টি করে সঙ্গীতের ভাবময় রূপ—যে রূপ উপলব্ধি করে প্রথমে মন ও পরে বুদ্ধিসহকৃত বোধি। বোধির দ্যুতিশীল রূপই জ্ঞান—সে জ্ঞানে থাকে বিষয়পরিশুদ্ধ অনুভূতির দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনা। এই অনুভূতিকে প্রদীপ্ত করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে খ্রীষ্টীয় সতেরশো শতকের গোড়ার দিকে ধ্যানমন্ত্র ও চিত্র। তখন স্বরকম্পন রস ও ভাব পর্যায়ে উন্নীত হয় এবং সার্থক সুরস্রষ্টা ঐ রস ও ভাবে নিজের অনুভূতিসত্তাকে একীভূত করেন এবং সঙ্গীত সাধনার সার্থকতাই তাই।

সঙ্গীতে স্বর উপাদান এবং স্বর শব্দকম্পনের সমষ্টি। যে স্বর আমরা স্থূলাকারে পাই তার নাম বৈখরীনাদ। এই বৈখরীনাদ ব্যক্ত, আর অব্যক্ত আকারে আরও তিনটি সূক্ষ্মশব্দ বা নাদ থাকে, তাদের নাম মধ্যমা, পশ্যন্তী ও ও পরা। পরাশব্দ কুণ্ডলিনীশক্তির প্রথম প্রকাশ। দ্বিতীয় প্রকাশ পশ্যন্তী ও তৃতীয় প্রকাশ মধ্যমা। মধ্যমা পরা ও পশ্যন্তী এবং বৈখরী নাদের সেতু বা সংযোগস্থল। সঙ্গীতের শব্দ বা নাদ শক্তিরূপে নিহিত থাকে বা শক্তির স্বরূপে থাকে কুণ্ডলিনীশক্তি রূপে। কুণ্ডলিনী অব্যক্ত আকারে সুপ্ত-প্রাণশক্তি। সঙ্গীতের সকল শক্তি ও প্রেরণা থাকে ঐ কুণ্ডলিনীতে মহাকারণ রূপে। মহাকারণ থেকে বিচ্ছুরিত শক্তি কারণ বা সূক্ষ্মতম-নাদ ; সূক্ষ্মতর নাদ পশ্যন্তী

—যার কিছুটা অনুভূতি হয় বোধির জগতে। সূক্ষ্মনাদের নাম মধ্যমা এবং এই মধ্যমানাদই বাইরে শব্দ কম্পনের আকারে প্রকাশিত হয়। এই শব্দের নাম বৈখরী। সঙ্গীতদর্শনের মূলকথা তাই অনাহত-নাদ এবং ঐ অনাহত নাদের রূপ তিনটি মূর্তি—পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমার আকারে অভিব্যক্ত হয়। বৈখরীনাদের নাম আহত-নাদ। আহত-নাদ প্রকাশ পায় বাতাস বা বায়ু যখন কণ্ঠযন্ত্রে আঘাত করে। এই আঘাতকেই বলে আহত বা আহত নাদ। সঙ্গীতদর্শনের মর্মকথাই তাই নাদ—সুসঙ্গত ও সুমিষ্ট শব্দ। সঙ্গীতশিল্পের এই রহস্যকথা সঙ্গীতদর্শনের মধ্যেই নিহিত। বিষয়টি সহজবোধ্য নয়। সাধারণ সঙ্গীতশিল্পীরাও এ'সব নিয়ে আলোচনা করেন কিনা জানি না। তবে সার্থক শিল্পী বা সঙ্গীত-সাধক যাঁরা, যাঁরা সঙ্গীতসাধনার মধ্য দিয়ে জীবনে শান্তি পেতে চান, যাঁরা জীবনসিদ্ধির পথে সাফল্য লাভ করতে চান তাঁরা এই তত্ত্ব নিয়ে অবশ্যই আলোচনা করেন; কথাই তাই যে, কেবলই শব্দব্রহ্ম নাদব্রহ্ম বল্‌লে সঙ্গীতদর্শনের যথার্থ তত্ত্বকে জানা যায় না। শার্ঙ্গদেব 'সঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থের গোড়ায় পিণ্ডোৎপত্তি-প্রকরণে এই নাদ-তত্ত্বেরই আলোচনা করেছেন। সঙ্গীতে সাত স্বর ও স্বরের আরোহণ অবরোহণক্রমে বিচিত্র রাগের সৃষ্টি হয় সত্য কথা, কিন্তু সঙ্গীতে দর্শনতত্ত্বের আলোচনা ও উপলব্ধি করতে গেলে ঐ নাদতত্ত্বের রহস্য অবশ্যই অবগত হওয়া আবশ্যক। সঙ্গীতশিল্পের আলোচনা ও অনুশীলন যাঁরা করেন তাঁদের কাছে এই তত্ত্ব জানার ও উপলব্ধি করার জিনিস।

সঙ্গীতে দর্শনদৃষ্টির আলোচনায় আমরা স্বীকার করি ঋষি পতঞ্জলি নির্দিষ্ট অষ্টাঙ্গ সাধনার ও অন্তর্নিবেশ আরো সঙ্গীতের সাধনায়—বিশেষ ক'রে রাগ-রাগিণীদের ধ্যানে ও মূর্তিকল্পনায়। বৈদিক যুগের সমাজে যাগযজ্ঞের প্রচলন ছিল এবং ঐ কর্মানুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ ছিল অগ্নিশিখায় বিভিন্ন দেবদেবীদের চিন্তা ও সেই সঙ্গে ছিল তাদের কাজে অভিষ্ট অভিলাষ পূরণেরও আকাঙ্খা-আকুতি। তখন দেবতাদের আরাধনা ছিল যজ্ঞাগ্নির বিভিন্ন শিখায় এবং অগ্নিমুখেই দেবতারা পূজা ও আহুতি গ্রহণ করতেন। বৈদিকোত্তর যুগেও ঐ পদ্ধতির প্রচলন ছিল, যদিও কিছুটা পরিবর্তিত আকারে। কিন্তু রাগ-

রাগিণীদের ধ্যানের ও রূপকল্পনার কোন নিয়মপদ্ধতি ছিল না। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে বিভিন্ন রাগের রূপচিন্তার কল্পনা যে ছিল না, তা নয়, কেননা শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে 'শিবপূজারত', 'লক্ষ্মীদেবী প্রীতি-করত্বাৎ' প্রভৃতি শব্দ ভৈরবী, বোট্ট বা ভোট্ট প্রভৃতি রাগের সার্থকতা-কল্পনায় উল্লেখ করেছেন, আর করেছেন বিভিন্ন জাতিরাগ, গ্রামরাগ, অন্তরভাষাদি রাগের স্বরবিলাসের কল্পনায়। তবে রাগের পুরোপুরি ধ্যানকল্পনা ও মূর্তিকল্পনার সূচনা হয় ষোড়শ শতকের পর খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের সূচনায়। পণ্ডিত সোমনাথের গ্রন্থেই পাই রাগগুলির বাস্তব মূর্তিকল্পনায় বিচিত্র শৈলীর বর্ণনা। তখনই ধ্যানের উপকারিতা বিশেষভাবে অনুভূত হোল সঙ্গীত-সাধনার ক্ষেত্রে। এর আগেও নিশ্চয়ই এই ধারণা ছিল বীজাকারে নিহিত। কোন রাগরাগিণীর স্বরূপকে সুষ্টুভাবে প্রকাশ করতে গেলে প্রয়োজন হয় তার রূপকল্পনা ও রূপে নিজের চিত্তকে সমাহিত করা। এই সমাহিত করার সার্থকতা হোল প্রথমে সেই রাগ বা রাগিণীর ভাবরূপ ও পরে নাদ বা শব্দময় রূপকে সৃষ্টি করা ও লীলায়িত করা। এই সমাহিত করার প্রকরণ পদ্ধতি থেকেই ধ্যান ও তার পূর্বে ধারণা ও তার আনুষঙ্গিক বাহ্য ও আন্তর অনুষ্ঠানগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়া। এই অনুষ্ঠানগুলিই আসলে যোগসাধনার অঙ্গীভূত এবং এই যোগসাধনার চিন্তা ও কর্মই সঙ্গীতের দর্শনচিন্তার ক্ষেত্রকে বিশেষভাবে প্রসারিত ও সুষমায়িত করে। কেবলই স্বরসাধনার জন্য কণ্ঠসাধনা ও গতানুগতিক সঙ্গীত ব্যাকরণরূপ থিওরী বা ঔপপত্তিক জ্ঞানের আলোচনা করায় রাগসাধনার ক্ষেত্রকে সার্থক করে তুলতে পারে না এবং পারে না বলেই আজও বহু সঙ্গীতানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নামকরা সঙ্গীতশিল্পীদের কাছ থেকে রাগরূপের তথা সঙ্গীতের প্রাণের পরিচয় আমরা পাইনা, বরং হতাশই হই আমরা কতকগুলি যান্ত্রিক ও মেকানিক্যাল সৃষ্টির প্রাচুর্যে।

সঙ্গীত যে আধ্যাত্মসাধনা—একথাই মনে করতে বলি প্রতিটি সঙ্গীতশিল্প সাধনার পথচারীদের। আর এরই জন্য প্রয়োজন সঙ্গীতশিল্পের দার্শনিক তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি ও ভালবাসার ভাব সৃষ্টি করার। মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে

CENTRAL LIBRARY

এই দৃষ্টি ও ভাবের প্রতিই সঙ্গীতশাস্ত্রী ও সঙ্গীতশিল্পীদের দেখা যায় আকাঙ্খা-আগ্রহ। ভারতের অন্তর ও তত্ত্বদৃষ্টিই ভারতীয়সঙ্গীতের প্রাণ-স্পন্দনকে করেছিল সচঞ্চল ও মুখর, এবং সেই ধারার আকুলতাই অব্যাহত রয়েছে আজও পর্যন্ত। তবে সামাজিক পরিবেশের ও দৃষ্টির পরিবর্তন হয়েছে স্বীকার করি, এবং তারই সঙ্গে স্বীকার করি যথার্থ শিল্পীমনোভাবের ক্ষেত্রও হয়েছে অনেকটা অবরুদ্ধ। কারণ কি এর ঠিক জানি না। তবে মনে হয়, সঙ্গীত-আলোচনার জগতে সঙ্গীততত্ত্বদৃষ্টি হয়েছে অনেকটা ম্লান এবং সঙ্গীত সাধক ও সঙ্গীতসাধনার মাধ্যমে জীবনসিদ্ধির পথকে সবল ক'রে রাখার উপযোগিতাকে ঠিক গ্রহণ করেন না। সঙ্গীতের দর্শনদৃষ্টি কিন্তু সঞ্জীবিত করে সাধকের জীবন ও প্রেরণাকে।

CENTRAL LIBRARY

প্রবাল দাশগুপ্ত

# বাঙলা ব্যাকরণ নিয়ে কী করা যায়

এরকম ব্যাকরণ এতদিন ধরে ছাত্রছাত্রীদের পড়তে বাধ্য করা নিতান্তই সময়ের বাজে খরচ। ক্লান্তি জমে।

তার মানে এ নয় যে, ও পাট একেবারে তুলে দেওয়াই ভাল। নয় কেন? ব্যাকরণ না পড়িয়ে কি ঠিকমতো বাঙলা লিখতে পড়তে শেখানো সম্ভব নয়? তা বোধহয় সম্ভব—সেটা কথা নয়। আসল কথা হলো, ভাষার রকমসকম নিয়ে অনেকের বেশ কৌতূহল আছে—কথার খেলায় ধাঁধায়টাধায় প্রকাশ পায়; স্বাভাবিকও এটা, ভারতের মতো বহুভাষী দেশে বিদ্যালয়ের বাঙলা পাঠক্রম যে অসহ্য তার একটা দিক তো এই, যে, ওই সুস্থ কৌতূহলের সঙ্গে প্রচলিত বাঙলা ব্যাকরণের সম্পর্ক নেই বললেই চলে। ওইটে যদি থাকে, তাহলে ব্যাকরণকে একেবারে নির্বাসন দেওয়ার দরকার নেই।

সম্পর্ক নেই তো, করতে কতক্ষণ? ইচ্ছে যদি থাকে, ভয়ানক সব জটিলতা এনে না ফেলেও ভাষার আশ্চর্য বা মজার দিকগুলো নিয়ে কথা বলা যায়।

খুব ছোট ছোট জিনিষ। প্রশ্ন করার জন্যে যে শব্দগুলো ব্যবহার করি —কখন, কোথায়, কোন্—সে সব প্রশ্নের না-ওয়ালা উত্তর দিতে গেলে ওই শব্দগুলোর শেষে একটা ক'রে '-ও' জুড়ে দিই আমরা: 'কখনো (কখন-ও)

হবে না', 'কোথাও নেই,' 'কোনো লোক দেখে নি।' কিন্তু 'কী' আর 'কে'-র বেলায় দেখি, 'কীও' বা 'কেও' বাঙলায় বলে না। তার বদলে বলে, 'কিছু না'। 'কেউ না।' 'কেউ' এর বেলায় না হয় ও-টা উ হয়ে গেছে—যদিও কেন গেছে সেও এক প্রশ্ন ('সেও, তো বলে, 'সে-উ'' হয়ে যায় না তো।) কিন্তু 'কিছু'-তে কি ধ'রে নেব 'ও' থেকে একেবারে 'ছু' ? হ য ব র ল-র বেরালের তালব্য শ-র মতো দাঁড়িয়ে যাচ্ছে না ব্যাপারটা ? এর উত্তর পাই একটু অন্য দিকে তাকালে। 'ঘি' থেকে বলি 'ঘিয়ের সঙ্গে'; 'ঘিয়ে কিন্তু ভাজা', 'কী' থেকে 'কীয়ের' বা 'কীয়ে' বলিনা—'কীসের', 'কীসে'। 'এর'বা '-এ' জুড়তে গেলে উটকো একখানা 'স্' এসে পড়ছে এ একমাত্র 'কী' শব্দেরই বৈশিষ্ট্য। তাহলে, 'কিছু'-র বেলায় বললেই হয়, একইরকম উটকো 'ছ' এসে পড়ছে ? এই তো, নিরীহ দেখতে একটা দু অক্ষরের শব্দ 'কিছু', তার জালিয়াতি বিলকুল ফাঁস হয়ে গেল। 'কখনো-কোথাও-কোনো'র '-ও' এখানে খামখা 'উ' সেজে ব'সে আছে, আর, মাঝখানে ফালতু, 'ছ' এসে জুটেছে—এইজন্যে, কথাটা যে আসলে 'কী+ও', এমনিতে তা মালুম হয় না।

'এমনিতে' হয় না—কী ক'রে হয় তাহলে ? সেটা তো ভেবে দেখতে-হবে ?—প্রশ্নটা প্রথম উঠল কী সূত্রে ? আমরা কয়েকটা সাদাসিধে প্রশ্নোত্তরের ধাঁচ মিলিয়ে দেখছিলাম পুলিসের রেকর্ড থেকে, তাতে দেখলাম এগুলো একই ধাঁচের।

| | |
|---|---|
| কোন্ লোক দেখেছে | কোন্-ও লোক দেখে নি। |
| কে দেখেছে ? | কে-উ দেখে নি। |
| কী দেখেছে ? | কি-ছ্-উ দেখে নি। |

তারপর আরো গোয়েন্দাগিরি ক'রে দেখলাম, 'কেও দেখেনি' বা 'কীও দেখে নি'—এ রকম ক'রে কেউ কথা বলে না, যদিও স্বচ্ছন্দে বলতে পারি 'দে-ও বাড়ী নেই, তাঁর ঝি-ও আসে নি' (কোনো একজন শ্রীযুক্ত দে)—'দেউ' বা 'কিছু' বললে সবাই আঁতকে উঠবে। তাহলে বলতেই হচ্ছে, বাঙলায় 'কেও' আর 'কীও' ব'লে যে দুটো শব্দ থাকার কথা ছিল তাদের সীট দখল ক'রে ব'সে আছে যথাক্রমে 'কেউ' আর 'কিছু'। ও থেকে উ হয়ে যাওয়া

CENTRAL LIBRARY

মজার ঠিকই, তবে কিছুর মধ্যে কিছু না অমূলক 'ছ' এসে পড়া আরো বেশি মজার ঘটনা তো, তাই আমরা কিছু-র পিছনে একটু বেশি সময় দিলাম—'কী' কথাটার মেডিকাল রিপোর্ট চেয়ে পাঠালাম। 'ঘি, ঝি'তো অনেকটাই একরকম শুনতে—ওদেরটাও মিলিয়ে দেখার ইচ্ছে, যাতে পরিষ্কার দেখতে পাই স্বাভাবিক শব্দের সঙ্গে 'কী'-শব্দের তফাত ঠিক কোথায়। মেডিকাল রিপোর্টে জানা গেল—

| | | | |
|---|---|---|---|
| রোগী | ঘি | ঝি | কী |
| নাড়ী | ঘিয়ে | ঝিয়ে | কীসে |
| তাপমাত্রা | ঘিয়ের | ঝিয়ের | কীসের |

মানে 'কী' ভীষণ স্পর্শকাতর—গায়ে হাত দিলে ফোসকা পড়ে (কার হাত তার ওপর নির্ভর করবে কেমন ফোসকা; '-এ' বা '-এর' যদি হাত দেয়, ফোসকা তাহলে 'স্'; '-ও'-র বেলায় ফোসকা পড়ে 'ছ্')। তদন্ত শেষ।

ব্যাকরণের বেশির ভাগ তদন্তেই এরকম পুলিসী, ডাক্তারী কাজের অংশ থাকে। যে কথাটার পিছু নিয়েছি সেটা অনেক শব্দের সঙ্গে—প্রশ্নে উত্তরে, কথায় বার্তায়—কী রকম ব্যবহার করে, কার সঙ্গে কেমন মেলে কেমন মেশে, এই সব হলো গোয়েন্দাগিরির বিষয়। আর, একা একা শব্দটা কেমন থাকে—এ হলো তার স্বাস্থ্যের খবরাখবর। দুটোই ব্যাকরণের খেলার অংশ স্রেফ—শব্দ 'অসুস্থ' হ'লে তার চিকিৎসা করা হয় না, 'দোষী' শব্দের হয় না শাস্তি। কিন্তু এ দুটো না হ'লে খেলা তেমন জমে না। ক্রিকেটের জন্যে যেমন অসীম যত্নের সঙ্গে পিচ তৈরী রাখতে হয় তেমনি ভাষা নিয়ে খেলার জন্যে চাই কথারা কোথায় কেমন থাকে, কেমন চলে ফেরে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজখবর। এ সব না বলে ছাত্রদের খালি 'দ্বিতীয়া বিভক্তি,' 'অধিকরণ কারক,' 'সম্বন্ধ পদ'-এর মতো ইঁট যদি ছুঁড়ে মারি বছরের পর বছর, তারা তো চটবেই, বড় হবার পরেও একটা অপ্রসন্নতা থাকবে টুলো পণ্ডিতদের ওপর। বিশুদ্ধ ভাষা গবেষণাকে বেশির ভাগ বুদ্ধিমান লোকও যে এড়িয়ে চলে, সে কি সাধে? ছন্দ আমাদের রক্তে কী করে সাড়া তোলে তার গল্প তো তবু নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ-এর মতো কবি এমন ভাবে বলেছেন যাতে সাধারণ পাঠক ভয়ানক কালোয়াতী কসরত না করেও বুঝতে পারেন মজাটা কোনখানে; কিন্তু কোথায় সেই লেখা যা প'ড়ে সাধারণ বাঙালীও জানবেন যে, বৈয়াকরণ নীরস হলেই ব্যাকরণ শুকনো, না হ'লেই তা নয়।

CENTRAL LIBRARY

বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

# শব্দ ঃ ভাষা ঃ ভাষ্য

কোন শান্ত জলাশয়ে টুপ্ করে একটা ঢিল ছুঁড়ে দিন। ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে? জলের সব দিক্ জুড়েই বৃত্তাকারে তরঙ্গ উঠবে। সেই তরঙ্গ একটা, দুটো, অনেক তরঙ্গ তুলতে থাকবে—তাই না?

শব্দও এমনই। উচ্চারণমাত্র দশদিকে ছড়িয়ে যায়।

উপমাটি কি ঠিক হল? জলে ঢিল ছুঁড়ে দিলে, আমরা কথায় বলি, তরঙ্গ ওঠে। আসলে কিন্তু তা সমতলেই বিস্তৃত হয়—উপরে ওঠে না, নীচেও নামে না।

শব্দের বিস্তারের ব্যাপারে প্রাচীনেরা কদম্বরেণুর কথাও ভেবেছিলেন। কদম্বরেণু যেমন সবখানেই ছড়িয়ে যায়, শব্দও তেমনি।

কিন্তু এ-উপমাটিও বোধ হয় যথোচিত নয়। কদম্বরেণু হাওয়ায় উড়তে উড়তে উঁচু-নীচু সমতল সর্বত্রই ভেসে যায় বটে। কিন্তু শব্দ তো কেবলই ভাসে না। সে যেতে যেতে ধাক্কা খায়, ধাক্কা খেতে খেতে অজস্র শব্দমালার সৃষ্টি করে।

এই শব্দমালা সৃষ্টির রহস্য কি?

শব্দের সৃষ্টিরহস্য নিয়ে জৈন আচার্যগণ কিছু ভেবেছিলেন। তাঁরা মনে করতেন জলীয় পরমাণুসমূহ যেমন মিলিত হয়ে মেঘ সৃষ্টি করে, শব্দ

CENTRAL LIBRARY

পরমাণুগুলি তেমনি একত্রিত হয়ে শব্দরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

আচার্য ভর্তিহরিও তাঁর 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থে এই মতটি সমর্থন করেছিলেন।

কিন্তু এই যুক্তিটি কি শেষপর্যন্ত ধোপে টেকে? জলীয় পরমাণুসমূহ মেঘরূপে পরিণত হয় সত্য, কিন্তু একবার সে স্থূলরূপ নিলে, বেশ কিছুকাল এই রূপ নিয়েই অবস্থান করে। তারপর বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পড়ে নিজের স্থূলতার প্রমাণ দেয়। আবার বাষ্প হয়ে মেঘ হয়, মেঘ হয়ে বৃষ্টি হয়—এভাবেই সে ঘুরতে থাকে।

শব্দ কিন্তু এ-রকম নয়। শ্রুতিগোচর হওয়া মাত্র তার কাজ শেষ—আর কোন অন্য অবস্থান তার নেই।

আসলে সৃষ্টির প্রাসাদ গড়তে গেলে আগে চাই একটা ফাঁকা জায়গা বা অবকাশ। এই অবকাশ যোগায় কে? আকাশ।

আকাশ মানে শূন্যতা। শূন্যতা না থাকলে পূর্ণ করার তাগিদ আসে না। সৃষ্টির বীজমন্ত্র তো এই আকাশেই লুকিয়ে আছে।

আকাশকে সৃষ্টি করল কে?

আত্মা থেকেই আকাশ জন্মাল। আকাশ জন্মাল মানে একটা ফাঁকা জায়গা তৈরী হল। কিন্তু,এ তো চোখে দেখা যায় না, ছোঁয়াও যায় না। তবে এর প্রমাণ কি? কি গুণ আছে আকাশের?

শব্দই আকাশের সেই গুণ। নাক দিয়ে যেমন আমরা গন্ধরূপ গুণ অনুভব করি, কান দিয়ে তেমনি শব্দরূপ গুণ গ্রহণ করা হয়। শব্দের ঠিক কোন অবয়ব নেই, আবার একে একেবারে নিরবয়বও বলা চলে না। কারণ নিরবয়ব কিছু বাহ্য ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হতে পারে না, অথচ শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য।

মোটা দাগে শব্দকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—ধ্বন্যাত্মক এবং বর্ণাত্মক। পৃথিবীর নানারকম পদার্থের অভিঘাতে যে শব্দের সৃষ্টি তা-ই হল ধ্বনি। আর কণ্ঠ তালু ওষ্ঠ ইত্যাদি থেকে উৎপন্ন অ আ ক খ প্রভৃতি শব্দই হল বর্ণ।

প্রাচীনেরা আর একভাবেও শব্দের প্রকারভেদ করেছেন। শব্দ আদিতে

CENTRAL LIBRARY

ছিল পূর্ণ এবং অখণ্ড। সেই আদিম পূর্ণ শব্দের নামই ওঁকার। পরে সেই ওঁকার খণ্ড খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে যায়। প্রথম স্তরের নাম পরা, পরের দুটি স্তর যথাক্রমে পশ্যন্তী ও মধ্যমা। শেষ স্তরটির নাম বৈখরী। বৈখরীই আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কণ্ঠতালু ইত্যাদির অভিঘাতে উৎপন্ন।

এই শব্দাবলির আবার মোটামুটি দুটি ভাগ : সংহত আর অসংহত।

সংহত-অসংহত না হয় হল, কিন্তু এর সূত্র কি ?

সূত্র হল নাদ।

বর্ণ রূপে যা অসংহত, নাদরূপে তা-ই সংগ্রথিত। নাদ থেকেই সঙ্গীতের জন্ম।

টুকরো টুকরো অজস্র শব্দের ধাক্কায় আমরা সর্বদাই বিপর্যস্ত। এর নাম বিষম স্পন্দন। একে সুষমরূপ দিতে পারে সঙ্গীত। টুকরো শব্দাবলি সেখানে গলে যায় অখণ্ড নাদপ্রবাহে। শব্দজাল ছিঁড়ে-খুঁড়ে আমরাও ভেসে যাই মহা আনন্দে।

সুষম স্পন্দনের আবার বিবিধ ভঙ্গী, যার সঙ্গে ভাবের বা রসের যোগ খুবই নিবিড়। কোন স্পন্দনে আমরা জেগে উঠি, কোনটায় বা ঘুমাই। কোনটায় জাগে হর্ষ, কোনটায় বা বিষাদ। বাইরের প্রাকৃতিক জগতেও এই স্পন্দনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সঙ্গীতে রাগ-রাগিণীর উদ্ভবও বোধ হয় এখান থেকেই। দীপক রাগে আগুন জ্বলা; মল্লারে বৃষ্টিপাতের কথা তো আমরা শুনেছি। এখন বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন এ-সব নিছক গাঁজাখুরি গল্প নয়—এসবেরও মনস্তাত্ত্বিক কারণ আছে। এমন কি, সঠিক শব্দাঘাতে এখন নানারকম রোগনিরাময়ের কথাও ভাবা হচ্ছে।

ব্যাপারটি অভিনব কিছু নয়। ঝাড়ফুঁক-মন্ত্র-উচাটন আদতে কি এই শব্দশক্তিই নয় ? ভূতে-পাওয়া মানুষের কানের কাছে ওঝারা যে-সব খিস্তি-খেউর করেন বুঝতে অসুবিধা হয় কি সেই শব্দাবলি কর্ণকুহরে প্রবেশ করানোই হল আসল নিদান ?

কেবল মানুষই নয়, বাঘের হাত থেকে রেহাই পেতে গেলেও আউলিরা ঐ একই পন্থা অবলম্বন করেন। সেখানেও হাতে লাঠি-অলা আউলির

মুখনিঃসৃত আপাত-অশালীন শব্দাবলি আক্রমণোদ্যত বাঘকে স্থির করে রাখে, শেষে বিতাড়িতও করে।

শব্দশক্তির এ-সব অসাধারণ ক্রিয়কলাপের যেহেতু বেশির ভাগই গুহ্য তথা গুপ্তাচার, তাই এ-বিষয়ে অদ্যাপি তেমন বিশদ আলোচনা হয়নি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কার-মুক্ত মনে অবিলম্বে এসবের পুনর্বিচার প্রয়োজন।

বিচক্ষণ পাঠক হয়তো অনুমান করতে পেরেছেন, শব্দের খণ্ডিত রূপ আমাদের কাঙ্খিত নয়, যদিও সাহিত্যের সঙ্গে সংযুক্ত বর্ণাত্মক শব্দের প্রতিই আমাদের সমধিক পক্ষপাত।

এই বর্ণাত্মক শব্দই উচ্চারণ করে সামাজিক মানুষ পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করে থাকে। উচ্চারিত এই শব্দই পরে লিপিতে স্থিত হয়।

যত সহজে বললাম ব্যাপারটি কিন্তু ততো সহজ নয়। উচ্চারিত শব্দের যথাযথ লিপিকরণ সর্বদা কি সম্ভব? আসলে আপ্রাণ চেষ্টা করেও আমরা উচ্চারিত শব্দের কাছাকাছি যেতে পারি মাত্র।

তথাপি লিপিকরণের গুরুত্ব বোধ হয় থেকেই যায়—ভাষার একটা কাজ-চালানো গোছের সাধারণ মান বজায় রাখার জন্যেই। নইলে মুখের কথাকে ধরে রাখাই যেত না। যদি বা অন্য কোনভাবে ধরা হত, (এখন যেমন টেপ্ ইত্যাদিতে সম্ভব) অঞ্চলে অঞ্চলে ভাষার ভিন্নতা গড়ে ওঠাও বিচিত্র হত না। লিপিকরণেও যে সবসময় অভিন্নতা অক্ষুণ্ণ রাখা গেছে তা বলছি না। 'এ' 'ও' এবং কিছুটা 'অ' কে নিয়ে উচ্চারণে বেশ ঝামেলায় পড়তে হয়। 'বেলা একটা' এবং 'বেলাভূমি' এই দুটিতেই 'বেলা' শব্দ আছে, কিন্তু এদের উচ্চারণ কি এক?

'হইল'-র সংকুচিত রূপ হ'ল, হোলো, হোল এবং হল এই চাররকম রূপই বাংলায় চালু—আপনি কোনটিকে সঙ্গত ভাববেন? 'অ'-এর সমস্যাও অনুরূপ। 'আমি কাল আসব' 'মেয়েটি কাল' 'তিনি কালগ্রাসে পতিত হলেন'—এই তিনটি বাক্যের 'কাল' শব্দটি কি একরকম উচ্চারণ হয়?

উচ্চারণের লিপিকরণে আর একধরনের অসঙ্গতিও আছে। ভাবের খাতিরে আমরা একই কথা নানাভাবে উচ্চারণ করি। উচ্চারণের পার্থক্য কি

সর্বদা বাক্য-বিন্যাসে ধরা পড়ে ? ইংরেজিতে ইটালিক্স-এ, বাংলায় শব্দের তলায় দাগ কেটে অনেক সময় আমরা শব্দের গুরুত্ব বোঝাতে চাই, কিন্তু তা কি সর্বদা ভাবানুযায়ী হয় ? হতে পারে না। উদাহরণ রাখি : আমি যাব।

সামান্য এই দুটি কথা নানাভাবে উচ্চারিত হতে পারে। আর সেই উচ্চারণের পার্থক্যের দরুন বক্তব্যেরও হেরফের হতে বাধ্য। কতরকমেই যে এদের উচ্চারণ করা যায় !

১। বক্তা শুধু শ্রোতাকে জানাতে চান তাঁর যাওয়াটা স্থির হয়েছে, আর কিছু নয়। এক্ষেত্রে 'আমি' কিংবা 'যাব' কোনটার ওপরেই তেমন জোর দেওয়ার দরকার নেই।

২। এই বাক্যটিতেই 'আমি'-র ওপর জোর দিলে কি মানে দাঁড়াবে ? আর কেউ যান বা না যান, বক্তা যাবেনই।

৩। 'যাব'-র ওপর জোর দিলে মানে হয়, ঠিক হোক বা না হোক, বক্তা যাবেনই।

৪। জিজ্ঞাসার সুরে দুটি শব্দকে উচ্চারণ করলে অর্থ হয় : বক্তা জানতে চাইছেন তিনি যাবেন কি যাবেন না।

এভাবে এই শব্দ দুটিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করলে আরও অনেক অর্থ বার করা যায় লিপিকরণে যা ধরা পড়ে না। তবুও ভাষার স্বার্থেই লিপিকরণ প্রয়োজন। নইলে ভাষার রাজ্যে মাৎস্যন্যায়ের সৃষ্টি হত।

শব্দের সঠিক বানান নিয়েও মাঝেমাঝে বেশ মুশকিলে পড়তে হয়। 'মুশকিল' এই শব্দটির কথাই ধরুন না। রেওয়াজ অনুযায়ী এর বানান : মুস্কিল। যে ভাষা থেকে শব্দটি ধার করে আনা হয়েছে হয়তো তা 'স'-অনুগই কিন্তু বাংলা ভাষায় সব-ই তো 'শ'-ঘেঁষা। বুদ্ধদেব বসু তাই এ-সব শব্দকে সঙ্গত ভাবেই 'শ'-য় বেঁধে ফেলেছেন। রবীন্দ্রনাথ তখনকার দিনে প্রচলিত 'রাণী'-র ণত্ব ঘুচিয়েছিলেন এই যুক্তিতে যে রাজ্ঞী সংস্কৃত শব্দ। তার বানানে কোন নড়চড় নেই। কিন্তু তার থেকে বেরিয়ে-আসা রানী কেন ণ-ত্ব বিধি মেনে চলবে ? বিশেষ করে বাংলা উচ্চারণে রাণীও যখন 'রানী' এভাবেই উচ্চারিত হয় ?

বিদেশী, দেশী বা তদ্ভব শব্দের উচ্চারণ-অনুযায়ী বানানে কবি-সাহিত্যিকরা যতটা তৎপর, তৎসম শব্দের ব্যাপারে কিন্তু তেমন নন। রবীন্দ্রনাথ তদ্ভব অব্দি এসে থেমে গেছেন, বুদ্ধদেব প্রমুখ বিদেশী-দেশী নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। কিন্তু তৎসম শব্দের বাংলা উচ্চারণ যেমনই হোক তার বানান থাকবে অচল ও অনড় ? ভাবুনতো 'পদ্ম' বা 'লক্ষ্মী' শব্দটির ম-কার সমেত উচ্চারণ কজনের মুখে শুনেছেন ? কিম্বা 'আত্মা'-র 'ম' ? 'হৃদয়'-এর হ ?

তৎসমের উচ্চারণ অনুযায়ী বিকৃত বানান যদি অগ্রাহ্য হয় তবে বিদেশী শব্দের বিকৃতি কোন্ যুক্তিতে মান্য ? যেহেতু তা সংস্কৃত নয়, তাই ? অথবা বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে যেহেতু তৎসমই পাল্লায় ভারী, অতএব ? প্রসঙ্গটি গুরুতর। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রের কাছে নয়, কেননা তাঁরা গেল-গেল রব তুলবেন, কবি-সাহিত্যিকদেরই ব্যাপারটি ভেবে দেখতে বলি। কোন বর্ণের সঠিক উচ্চারণ না করতে পারার মধ্যে হীনতা বা দীনতা কিছু নেই— দেশের জল-হাওয়াই উচ্চারণকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করে।

শব্দের উচ্চারণে দেশের জল-হাওয়া অবশ্যই বড় রকমের প্রভাব ফেলে, কিন্তু ঐতিহ্য, পারিবারিক পরিবেশ ইত্যাদিও তো সাময়িকভাবে সক্রিয় হয়। দেশবিভাগের পর ওপার-বাংলার অনেক পরিবারকে এদিকে আসতে হয়েছে। এখানে এইসব পরিবারে যে নতুন ছেলে-পুলে হয়েছে তারা পারিবারিক সূত্রেই কিন্তু 'বাঙাল' এই উপ-ভাষায় কথা বলে। যাঁরা আর একটু আগে এসেছেন তাঁদের পরিবারের নতুন ছেলে-মেয়েরা বলে অদ্ভুত এক মিশ্রভাষায়। একটু লক্ষ্য করলে টের পাই, এইসব নতুনের ভাষা 'বাঙাল' উচ্চারণের থেকে ধীরে ধীরে সরে আসছে।

এটাই স্বাভাবিক। কেননা, প্রত্যেক দেশের মৌখিক ভাষার উচ্চারণগত কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য থেকে যায়। তাকে চাপা দেওয়া যায় না, আপনি ফুটে ওঠে।

বাংলা ভাষারও এই ধরনের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। এখুনি যেটি মনে পড়ছে তার নাম দ্ব্যক্ষরময়তা। তৎসমের বহু-অক্ষরসম্পন্ন শব্দগুলি বাংলা উচ্চারণে দুই অক্ষরযুক্ত ধ্বনিগুচ্ছে পরিণত হয়। পাশাপাশি অন্য কোন ভাষায় এই বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না। মূল সংস্কৃত, হিন্দি

এবং শেষে দ্ব্যক্ষরময় বাংলা শব্দগুলি রাখলে ব্যাপারটা বোধহয় বোঝা যাবে।

রক্ষাপাল > রাখ্‌বাল > রাখাল, ভগিনীপতি > বহোনই > বেনাই। কেবল সংস্কৃত এবং বাংলা শব্দেরও কয়েকটি উদাহরণ রাখি ঃ

উৎপাটয়তি > উপড়য়, সমর্পয়তি > স'পে, আম্রাতক > আমড়া,

উষ্ণপনিক > উনান, প্রতিবেশিন্‌ > পড়শী ইত্যাদি।

বাংলা ভাষার যেমন দ্ব্যক্ষরময় বৈশিষ্ট্য আছে, অন্যভাষারও তেমনি অন্য-রকম বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। তাই প্রত্যেক ভাষার ব্যাকরণ গড়ে ওঠা উচিত তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রেখে।

বাইরে থেকে কোন কানুন চাপিয়ে দিলে তার ফল ভালো হতে পারে না। বাংলা ব্যাকরণের বেশির ভাগ ফতোয়াই কিন্তু সেকেলে সংস্কৃত ভাষা থেকে জারি করা হয়েছে। বারবার কানের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে গাল-ভরা এই আপ্তবাক্যটি ঃ সংস্কৃতই বাংলা ভাষার জননী।

জন্মরহস্যের কূটকচালির মধ্যে না গিয়েও বোধ হয় বলা যায়, বাংলা ভাষার বয়স হল ঢের। এখন আর মায়ের হাত ধরে হ'াটি-হ'াটি-পা-পা করা তার শোভা পায় না। নিজের পায়ে নিজেকেই তাকে দাঁড়াতে হবে। তার ব্যাকরণ তারই মতন তাকে গড়ে নিতে হবে। বাঁচার মত বাঁচতে হলে, আজ নয় কাল, তৎসমের মৌরসী পাট্টা তাকে ভাঙ্গতেই হবে। পুরনো কাসুন্দি ঘেটে আর কদ্দিন চলে বলুন ?

With Best Compliments of

M/S H. V. DOSHI & BROS.

4 Synagogue Street,

Calcutta-700001.

## "আশার"র বই মানেই ভালো বই

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্ত

**বাংলার কীট পতঙ্গ** ২০·০০

(পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ)

**করে দেখ (৩য়)** ৫·০০

ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

**বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ** ২০·০০

**সতু সেন : আত্মস্মৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ** ১২·০০

মুখবন্ধ/তাপস সেন ॥ সম্পাদনা/অমিতাভ দাশগুপ্ত

ভোলানাথ ভট্টাচার্য ও বেলা চক্রবর্তীর

**মৃত্যু : দাহ : সমাধি** ৬·০০

বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত

**[redacted]গীতের নানাদিক** ১০·০০

কমল চৌ·

**সায়গনের নরকে :** ১২·০০

**॥ ছোটদের বই ॥**

তারাপদ রায়

**আবার ভোডো ভাতাই** ৫·০০

**॥ অন্যান্য বই ॥**

প্রেমেন্দ্র মিত্র

**প্রেমের চোখে পরাশর বর্মা :** ৭·০০

অমলেন্দু চক্রবর্তী

**অবিরত চেনামুখ :** ১০·০০

**॥ ছড়ার বই ॥**

দীপঙ্কর চক্রবর্তী

**সীতারামের খেলা :** ৪·০০

আশা প্রকাশনী

৭৪, মহাত্মাগান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

CENTRAL LIBRARY


## রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী ৫·৫০ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রবীন্দ্র সুভাষিত ১২·০০ রবীন্দ্র-রচনার উদ্ধৃতিসম্ভার
যুক্তিবাদ আধুনিকতা ও আনন্দমীমাংসা ৩·৭৫ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিশ্ব-জিজ্ঞাসা ২০·০০ ডক্টর হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী ১০·০০ শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত
ভারতদূত রবীন্দ্রনাথ ৪·৭৫ ডক্টর হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবিদ্যা ৩·০০ শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার
শিব-ভাবনা ৯·৫০ ডক্টর সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু ৬·০০ ডক্টর ধীরেন্দ্র দেবনাথ
রবীন্দ্র-শিল্পতত্ত্ব ৮·০০ ডক্টর হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা ১৬·৫০ ডক্টর গৌরীশংকর ভট্টাচার্য
শিল্পতত্ত্ব ১৫·০০ বেনিডেট্টো ক্রোচে (অঃ ডক্টর সাধ[illegible]চার্য)

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ৬ | ৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন [illegible]লিকাতা-৭
পরিবেশক। 'জিজ্ঞাসা' ১ এ কলেজ রো কলিকাতা-৯

## ॥ কয়েকটি চিরায়ত গ্রন্থ ॥

| | | |
|---|---|---|
| শিল্পভাবনা ॥ | ভোলানাথ ভট্টাচার্য | দাম দশ টাকা |
| চার্বাক ফিলজফি (ইংরাজী) ॥ | দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী | দাম আট টাকা |
| বাংলার লোকশিল্প ॥ | কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায় | দাম দশ টাকা |
| বাংলার লোকশ্রুতি ॥ | আশুতোষ ভট্টাচার্য | দাম দশ টাকা |
| রূপচাঁদ পক্ষী ॥ | পক্ষধর ভট্টাচার্য | দাম পাঁচ টাকা |

প্রাপ্তিস্থান
বুকস্ এ্যাণ্ড নিউজ
২১ প্রতাপ স্মৃতি কনা'র বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২